LOVE THE PEOPLE!!! LOVE THE EARTH!!! MAKE IT A HEAVEN FOR ALL!!!

পোশাক শিল্পী

বিগত আঠারটা বছর আমার জীবনটা জড়িয়ে আছে গার্মেন্টস শিল্পের সাথে।......আমি একটি স্বপ্ন দেখি। আমি মনে মনে একটি ছবি আঁকি, যেখানে মনের ক্যানভাসের একপাশে গার্মেন্টস অপারেটররা মেশিন চালাচ্ছে এবং ক্যানভাসের অপর পাশে, তাদের সন্তানরা বিমান চালাচ্ছে, বিশাল বিশাল জাহাজ নির্মান করছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় ডাক্তার হিসেবে কাজ করছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইঞ্জিনিয়ার অথবা স্থপতি হিসেবে কাজ করছে, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করছে, আইটিসি বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছে, বিশ্বখ্যাত টিভি চ্যানেলসমুহে সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত, তাদের সন্তানদের অনেকে প্রখ্যাত গায়ক, কিংবা অভিনেতা ও অভিনেত্রী হিসেবে আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করছে, আবার অনেকের সন্তানরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধার জোরে স্কলারশীপের মত বিভিন্ন সুযোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত।.....

আহমেদুর রহমান

Education is a powerful weapon which you can use to change the world.

-Nelson Mandela

ব্যাপক গণসচেতনতা পরিবর্তনের জন্য অনেক বড় একটি শক্তি। একটি জিনিস যা আজকে বাস্তবে অসম্ভব বলে মনে হয়, ব্যাপক গণসচেতনতার কারনে কালকে তা সম্ভব ও হতে পারে।

আমার কথা কইবে পাখি করুণ করুণ ভাষে
আমার দুঃখ রইবে লেখা শিশিরভেজা ঘাসে
আমার গান গাইবে দুঃখে পথহারানো হাওয়া
আমার নাম বলবে মুখে মেঘের আসা-যাওয়া
ইন্দ্রধনু লিখবে লিখন কেমন ভালোবাসে
দীঘল নদী করবে রোদন সমাধিটির পাশে।

- কবি আহমদ ছফা

(জুন ৩০, ১৯৪৩ - জুলাই ২৮, ২০০১)

এলোমেলো কিছু কথা, এলোমেলো কিছু ভাবনা

আজ থেকে ৫৫ বছর আগে ১৯৬০ সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ছিল - মাত্র ৩ বিলিয়ন বা ৩ শ কোটি। আর ২০১৬ সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৫ বিলিয়ন বা ৭ শ ৫০ কোটি, মাত্র ৫৫ বছর আগের জনসংখ্যার দু'গুণের ও বেশি । গবেষকদের ধারণা হচ্ছে, আমাদের এই পৃথিবীর বয়স সাড়ে চার শ কোটি বছর। আর পৃথিবীতে মানব অস্তিত্বের সূচনা হয়েছিল ৬০ লাখ বছর আগে এবং আধুনিক মানব জাতির যাত্রা শুরু হয়েছিল দুই লাখ বছর আগে। সেই তখন থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ১ শ ৬০ কোটি এবং বিংশ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়াল ৬ শ ১০ কোটি - অর্থাৎ হাজার কোটি বছরে যেখানে জনসংখ্যা দাঁড়াল ১ শ ৬০ কোটি, আর তা মাত্র ১০০ বছরে বেড়ে গেল ৪৫০ কোটি। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৫০ সালে বিশ্বে জনসংখ্যা দাঁড়াবে নয় বিলিয়ন বা ৯ শ কোটি।

জাতিসংঘের তথ্য মতে, ২০৫০ সাল নাগাদ খাদ্যের চাহিদা ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। গবেষকরা বলেন, বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিরুপ জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে এবং ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে এখন থেকে যদি প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া না হয়, তাহলে ২০৪০ -২০৫০ সালের দিকে বিশ্বে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের কারণে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার আশংকা আছে এবং সেই পরিস্থিতি প্রায় দু'কোটি ৪০ লাখ শিশুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। মোট আয়তন ১৩০,১৭২ কিঃমিঃ (৫০,২৬০বর্গ মাইল) এবং ২০১৬ সাল পর্যন্ত মোট জনসংখ্যা ১৬০ মিলিয়ন বা ষোল কোটি (২০১৬)। আনুমানিক ৪৭ মিলিয়ন বা ৪ কোটি সত্তর লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। শিশু অপুষ্টির হার ৪৮% এবং প্রতি বছর ৫৩ হাজার শিশু অপুষ্টিজনিত জটিলতায় ভুগে মারা যায়।

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়ানোর স্বপ্নকল্প নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠীর ৬৬ শতাংশ অর্থাৎ ১০ কোটি ৫৬ লাখ মানুষ কর্মক্ষম, যাদের বয়স ১৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে।|বাংলাদেশের বিশাল এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে কুর্মদক্ষ করে গড়ে তুলে তাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির তাগিদ দেওয়া হয়েছে। (সূত্র: ইউএনডিপি -মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২৬ এপ্রিল, ২০১৬)। বাংলাদেশে প্রতি বছর আনুমানিক বিশ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করে, যাদের মধ্যে প্রায় পাঁচ লাখ উচ্চ শিক্ষিত।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়ানোর স্বপ্নকল্প এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে পোশাক শিল্প, জাহাজ নির্মান শিল্প, ঔষধ শিল্প, চামড়া শিল্প, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স খাত, ICT খাত, কৃষি খাত বিশেষ করে "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্প, জলবায়ু সহনশীল অংশগ্রহণমূলক বনায়ন ও পূণঃবনায়ন প্রকল্প, বিদ্যুৎ

উৎপাদন প্রকল্প, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর সহ বড় বড় প্রকল্পগুলোকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে -The grass is always green in the other side of the fence (বেড়ার ওপারে ঘাসগুলো সবসময় সবুজ-কোমল হয়)। আর সেই সবুজ-কোমল ঘাসের সন্ধানে অর্থাৎ নিজের এবং পরিবারের জন্য একটি নিরাপদ এবং সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করার আশায়, বাংলাদেশের কত ছেলে মেয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অবৈধভাবে সমুদ্র পথে থাইল্যান্ড – মালয়েশীয়া যাওয়ার পথে সাগরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে কিংবা গণকবরে চিরনিদ্রায় শুয়ে পড়েছে, তার কোন সঠিক তথ্য কোথাও নেই। হতে পারে, তারা থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় ভালভাবে পৌঁছে সেখানে সৌভাগ্যবশত ভাল কোন কাজ যদি যোগাড় ও করতে পারে, তারা সেখান থেকে তাদের পরিবারকে বিশ /ত্রিশ হাজার টাকা পাঠাতে পারবে। কিন্তু তারা যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে এবং ভাল কিছু দক্ষতা অর্জন করতে পারে, সেই পরিমান টাকা তারা বাংলাদেশে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে কাজ করে ও সহজে উপার্জন করতে পারে।

এটা সত্য যে গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকরা এখনো অনেক ক্ষেত্রেই অনাদর, অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার। অথচ গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের হাতে লুক্কায়িত সকল দক্ষতা, সক্ষমতা ও সম্ভাবনালোকে যদি আরও সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়, তাহলে তারা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে আরও অনেক দুর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

এই কথাগুলো আরেকটু বিশদভাবে নিম্নে "অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ আকারে লিখার চেষ্টা করেছি, যেখানে বক্তব্য উপস্থাপনায় ধারাবাহিকতার স্বার্থে বেশ কিছু প্যারাগ্রাফের হুবহু পুনরাবৃত্তি করেছি।

বিগত আঠারটা বছর আমার জীবনটা জড়িয়ে আছে গার্মেন্টস শিল্পের সাথে। বিশেষকরে প্রডাকশনের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে দায়িত্ত পালন করার কারণে কয়েক হাজার শ্রমিক ছেলেমেয়েদের সাথে বাবা সন্তানের মত সম্পর্ক গড়ে উথেছে। এ দীর্ঘ জীবনে তাদের সুখ-দুখ, হাসি-কান্না যেরকম দেখেছি, ঠিক সেরকম দেখেছি – তাদের মধ্যে লুক্কায়িত আছে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে বহুদুর নিয়ে যাওয়ার এক যাদুকরি শক্তি।

আমি একটি স্বপ্ন দেখি। আমি মনে মনে একটি ছবি আঁকি, যেখানে মনের ক্যানভাসের একপাশে গার্মেন্টস অপারেটররা মেশিন চালাচ্ছে এবং ক্যানভাসের অপর পাশে, তাদের সন্তানরা বিমান চালাচ্ছে, বিশাল বিশাল জাহাজ নির্মান করছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় ডাক্তার হিসেবে কাজ করছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইঞ্জিনিয়ার অথবা স্থপতি হিসেবে কাজ করছে, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করছে, আইটিসি বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছে, বিশ্বখ্যাত টিভি চ্যানেলসমুহে সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত, তাদের সন্তানদের অনেকে প্রখ্যাত গায়ক, কিংবা অভিনেতা ও অভিনেত্রী হিসেবে আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করছে, আবার অনেকের সন্তানরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধার জোরে স্কলারশীপের মত বিভিন্ন সুযোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত।.....

আমার মনের একটি আকুতি আছে- **Love the people. Love the earth. Make it a heaven for all** - মানুষকে ভালবাসুন। পৃথিবীকে ভালবাসুন। সবার জন্য স্বর্গ গড়ুন। বেঁচে থাকার জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্ববাসীর জন্য শুধুমাত্র একটিই পৃথিবী আছে। এখানে মানুষ কেন মানুষের শত্রু হবে। মতাদর্শের ভিন্নতা, ধর্মের ভিন্নতা, দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা, এমনকি শারীরিক গঠনের ভিন্নতা - সমাজে, রাষ্ট্রে কিংবা বিশ্ব সমাজে থাকতেই পারে। সেই "ভিন্নতা" তো "শত্রুতা" হতে পারে না। পৃথিবীতে কয়জন বাবা-মা আছে, যারা সন্তানের মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে সন্তানকে ত্যাগ করতে পেরেছে। পৃথিবীতে কয়জন ভাই-বোন আছে, যারা ভাই-বোনের মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে ভাই-বোনকে ত্যাগ করতে পেরেছে। হতে পারে আমার এই কথাগুলো একেবারেই কাল্পনিক এবং বাস্তবতার দিক দিয়ে একেবারেই অসম্ভব। তবুও "অসহিষ্ণুতা" ও "অবিশ্বাস" –এর নিষ্ঠুর বাস্তবতার বিপক্ষে এবং বিশ্ববাসীর জন্য শান্তি ও কল্যাণের প্রত্যাশায়, অন্তত আত্মতৃপ্তির জন্য, অতবড় এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র এক প্রাণী হিসেবে আমার আকুতি ভরা কথাগুলো লিখে গেলাম। মতাদর্শের ভিন্নতা, ধর্মের ভিন্নতা, দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা, এমনকি শারীরিক গঠনের ভিন্নতা ইত্যাদিকে যদি মানব সমাজ ***"বিশ্ব বৈচিত্রের সৌন্দর্য" (Beauty of the Universal Diversity of the Human Society)*** হিসেবে মনে প্রাণে স্বাগত জানাতে পারে, তাহলে পৃথিবীটা সত্যিই সবার জন্য স্বর্গ হতে পারে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "সহনশীলতার মাধ্যমেই আমরা চলে আসি মহত্ত্বের কাছাকাছি"।

আসলে **"দারিদ্র্য"** - কেবলমাত্র **"দারিদ্র্য"** এবং **"জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ"** কেই বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা উচিৎ। আর মানব সমাজের সবচেয়ে বড় এই শত্রুদের কাছ থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য, বিশ্বের মানুষগুলো যদি একে অপরকে ভালবাসে, এই ভূমন্ডল, এই মাটি ও প্রকৃতিকে ভালবাসে, তাহলে ক্ষুধা, দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাংগামা, ঘৃণা, হিংসা-হানাহানিতে লিপ্ত কিংবা শিকারে পরিণত লক্ষ-কোটি মানুষের জন্য এই পৃথিবীতেই স্বর্গ নির্মাণ করা সম্ভব।

আমার মনের আরও আকুতি আছে- পৃথিবীর সব শিশুরা স্কুলে যাক, কলেজে যাক, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাক। পৃথিবীর সব মুকুলই প্রস্ফুটিত হোক। ওরা সু-শিক্ষায় শিক্ষিত হোক। পৃথিবীতে সম্মানের আসন তাদের জন্য নির্ধারিত থাকে, যারা জীবনে শিক্ষা, বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, সততা ও অভিজ্ঞতার ধাপগুলো সফলভাবে পার করতে পারে। বিশ্ব বরেণ্য নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছিলেন "Education is a powerful weapon which you can use to change the world - শিক্ষা একটি শক্তিশালী অস্ত্র যা আপনি বিশ্বকে পরিবর্তন করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। ওরা বিশ্বাস করুক - Beauty in simplicity.Beauty in purity. Beauty lies in the lap of nature – "সরলতাই সৌন্দর্য", "বিশুদ্ধতাই সৌন্দর্য", "সৌন্দর্য প্রকৃতিরই কোলে"।

ইংরেজ কবি P.B. Shelley বলেছিলেন 'Beauty is truth, truth beauty,' সৌন্দর্যই সত্য, সত্যই সৌন্দর্য। সত্যের মৃত্যু নেই। কাগজের ফুল থেকে কখনো সৌগন্ধ বের হবে না। পৃথিবীর শ্রেষ্ট আদালত মানুষের বিবেক। লোভ, হিংসা ও অহংকারেরে উর্ধ্বে উঠে বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকার শিক্ষায় ওরা শিক্ষিত হোক। ফুল যদি আসল হয়, ছিড়ে গেলে ও সুগন্ধ ছড়াবে। ওরা আরও বিশ্বাস করুক – Intellect is beauty – প্রজ্ঞাই সৌন্দর্য, No technology, No prosperity - যেখানে প্রযুক্তি নেই, সেখানে সমৃদ্ধি নেই - এই মন্ত্রগুলোতে দিক্ষীত হয়ে ওরা শিক্ষা, প্রযুক্তি, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা দিয়ে বিশ্বের জন্য শান্তি, সুখ এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক।

“আমি পাথরে ফুল ফুটাবো ভালবাস দিয়ে। আমি সাগরের ঢেউ থামাবো ভালবাসা দিয়ে” -গেয়েছিলেন শিল্পী অ্যান্ড্রু কিশোর আলম খানের সুরে, বাংলা মুভিঃ শেষ ঠিকানায়। বিশ্বের প্রতিটি মেহেনতি মানুষ যদি শিক্ষা, প্রযুক্তি, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা – এই হাতিয়ারগুলোকে নিয়ে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়ে, তাহলে মরুভুমিতে ও সফলভাবে ফসল ফলানো সম্ভব এবং অনেক অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

আমি একটি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। আমি দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর মুখ দেখেছি। যখনই আমি কোনো না কোনো সুযোগ কিংবা সময় পেয়েছি, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান, ভাষাগত সীমাবদ্ধতা, বক্তব্য উপস্থাপনায় ত্রুটি ও ভাব প্রকাশ ভঙ্গির অসামাঞ্জস্যতা ইত্যাদি সত্ত্বেও দারিদ্র্য বিমোচনে ও আর্ত-মানবতার স্বপক্ষে কিছু না কিছু লিখার কিংবা বলার চেষ্টা করেছি। উইনস্টন চার্চিল ১৯৪০ বলেছিলেন ‘দেওয়ার মতো কিছুই নেই আমার। আছে শুধু রক্ত, কষ্ট, অশ্রু আর ঘাম’। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমি সবসময় মনে মনে গভীর ব্যথা অনুভব করেছি। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও আমার ঘাম, আমার পরিশ্রম, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান-অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি কিছু করার ও চেষ্টা করছি। আজ থেকে অনেক বছর আগে যখন আমি কিছু সময় ও সুযোগ পেয়েছিলাম, তখন দারিদ্র্য বিমোচন ও জলবায়ু পরিবর্তনের উপর “ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, “বাংলাদেশ অবজারভার, “ঢাকা কুরিয়ার” সহ বিভিন্ন পত্রিকায় বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলাম। যেমন- "The Unexplored Power of Handicrafts to alleviate Poverty"(http:www.expobd.net/handicrafts.html), ‘Children in the Streets of Chittagong” (http:www.expobd.net/children.html), “Micro Credit for Poverty Alleviation” (http:www.expobd.net/poverty.html), “The Environmental Pollution in Chittagong” (http:www.expobd.net/environment.html), “The Rural Technology of Milk Pasteurization” ইত্যাদি।

বিগত আঠারটা বছর গার্মেন্টস শিল্পের সাথে জড়িয়ে থাকা আমার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন সময়ে অনেক এলোমেলো ভাবনা, অনেক এলোমেলো কথা মনের মধ্যে উদয় হয়েছে, ইচ্ছে ও হয়েছিল কিছু একটা লিখি। কিন্তু, অনেক বছর ধরে লেখালেখি থেকে একেবারে দূরে থাকার কারণে এবং পেশাগত প্রচণ্ড ব্যস্ততার কারণে মনের কথাগুলো একটু সুন্দরভাবে, শুদ্ধভাবে, গোছালোভাবে এবং ব্যাকরণগতভাবে দাড়ি-কমা সহ লিখতে পারব কিনা সেই সাহসটুকু ও হারিয়ে ফেলেছি। তবু ও চিন্তা করলাম, এলোমেলো আমার ভাবনাগুলো এবং কথাগুলো "পোশাক শিল্পী" নামে অন্তত একটি বই খসড়া আকারে হলে ও লিখে ফেলি। তবে জীবনে যদি কখনো সময় পাই, আবার একটু গোছালোভাবে ও শুদ্ধভাবে লেখার চেস্টা করব।

গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে সাধারণত দুপুরের আগে ও পরে এবং রাত্রে যদি ডিউটি থাকে তখন শ্রমিক ছেলে মেয়েদের একটু অলসতা ভাব কিংবা ঝিমুনি দূর করার জন্য এবং তাদের কাজের মধ্যে গতি সঞ্চার করার জন্য প্রডাকশন ফ্লোরগুলুতে সুনির্দিষ্ট সময়ে গান বাজানো হয়। লক্ষ্য করা গেছে যে পুরোনো দিনের ছায়াছবির গানগুলোই শ্রমিক ছেলে মেয়েদের সবচেয়ে প্রিয়। আমি এই বইটির গল্পের মধ্যে শ্রমিক ছেলে মেয়েদের সবচেয়ে প্রিয় গানগুলোর মধ্যে কয়েকটি গান সন্নিবেশিত করেছি। এক দিকে এই গানগুলো সন্নিবেশিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের পঁয়তাল্লিশ লক্ষ শ্রমিক ছেলে মেয়েদের ভালোবাসার প্রতিধ্বনি রাখার চেষ্টা করেছি এবং অপর দিকে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় চালিকা শক্তি গার্মেন্টস শিল্পের অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ লক্ষ সৈনিকদেরকে যে সব মহান গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পীবৃন্দ তাদের অজান্তে, তাদের গান দিয়ে প্রতিদিন প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রডাকশনের গতি পরোক্ষভাবে বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছেন এবং

সর্বোপরি বাংলদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামে পরোক্ষভাবে অনেক বড় অবদান রেখে চলেছেন, তাদের প্রতি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা জানানোর চেষ্টা করেছি।

সবশেষে, সম্মানিত পাঠকদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ- আমার সব ভুল-ভ্রান্তিগুলো ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

ধন্যবাদান্তে।

আহমেদুর রহমান
তারিখঃ মে ২৫, ২০১৬

Authorization: This book is free for publication.

পোশাক শিল্পী

=১=

হাবিব ও সাবিনা দুই ভাই- বোন। হাবিবের এক ছেলে মাহবুব ও স্ত্রী কুলসুমকে নিয়ে হাবিবের সংসার। সাবিনার এক মেয়ে রুহানা ও ছেলে খালেদকে নিয়ে কয়দিন আগে তার স্বামী সালমান সমূদ্র পথে থাইল্যান্ড হয়ে মালয়েশিয়া যাওয়ার পর বাবার বাড়ীতে চলে এসেছে।

বাবা-মা মারা যাওয়ার পর ভাই হাবিব, ছেলে মাহবুব ও স্ত্রী কূলসূম ছাড়া সাবিনার বাবার বাড়ীতে আর কেউ থাকেনা। সেদিন দুপুরে সাবিনা ছেলে খালেদ ও মেয়ে রুহানাকে নিয়ে বারান্দায় বসে ভাত খাচ্ছিল। ভাত খাওয়ার সময় খালেদ বারবার আব্বূ কখন আসবে জানতে চাচ্ছিল। আর আব্বূর কথা বলতেই রুহানার দু' চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে পড়তে ভাতের সাথে মিশে যাচ্ছিল। আর তখন সে ভাতগুলো কচলাইতেছিল। মা বারবার তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে তাদের আব্বূ আর কয়দিন পর মালয়েশিয়া থেকে অনেক টাকা, অনেক নতুন জামা ও খেলনা পাঠাবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে, সাবিনার ভাই হাবিব, ভাবী কুলসুম তাদের ছেলে মাহবুবকে নিয়ে স্কুল থেকে ঘরে ফিরল। সাবিনাকে ছেলে-মেয়ে নিয়ে খেতে দেখে কুলসুমের মাথায় আগুণ ধরে গেল। কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে থেকে অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল। সেখানে ভাত ও তরকারির ডেকসীগুলো এক নজর দেখে নিয়ে ডেকসীগুলো মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল। অতঃপর, সে দৌড়ে এসে সাবিনার ছেলে খালেদ ও মেয়ে রুহানার ভাতের প্লেট দুটো উঠানের দিকে ছুড়ে মারল। এই অবস্থাতেই, ভাই হাবিব ছেলে মাহবুবকে নিয়ে নীরবে নিজের রুমে চলে গেল। সাবিনা তখন বাচ্চা দুটোকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিজ কক্ষে চলে গেল।

কূলসুম যখন সাবিনার বাচ্চা দু' টোর ভাতের প্লেটগুলো উঠানের দিকে ছুড়ে মারছিল, তখন উঠানে দিপালী রাণী দাঁড়ানো ছিল। দিপালী হাবিব – সাবিনার মা হাফিজার ছোটবেলার বান্ধবী । দু' জনই ছোটবেলায় একই স্কুলে এবং একই ক্লাসে লেখাপড়া করত। হাফিজা মুসলমান ও দিপালী হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাদের দু' টি গ্রামই পাশাপাশি। ওরা প্রতিদি একসাথে স্কুলে আসা যাওয়া করত, একসাথে খাওয়া- দাওয়া করত এবং সবসময় ক্লাসে পাশাপাশি বসত। এ জন্য ওদের দু' জনকে সবাই বলত "***একটি ফুলের দুটি পাপড়ি***" । হাফিজা মারা যাওয়ার পর থেকে দিপালী দু' একদিন পরপর হাফিজার বাড়িতে হাফিজার ছেলেমেয়েদের খোজখবর নেওয়ার জন্য আসত।

কুলসুম যখন সাবিনার ছেলেমেয়েদের ভাতের প্লেটগুলো উঠানে ছুড়ে মারছিল, তখন ভাতের প্লেটগুলো উঠানে দাঁড়ানো দিপালীর পায়ের কাছাকাছি আছড়ে পড়েছিল। দিপালী তখন তাড়াতাড়ি প্লেটগুলো তুলে, যতটুকূ কাদা লাগেনি ততটুকু ভাত-তরকারিগুলো আস্তে আস্তে প্লেটে উঠাতে লাগল। এসময় তার দু'চোখ বেয়ে অনবরত পানি পড়তেছিল। অতঃপর, সে প্লেটগুলো সুন্দরভাবে বারান্দায় রেখে দিল। আর যতটুকু ভাত মাটিতে লেগে গেছে, সেগূলো আলাদা একটি পাত্রে নিয়ে পাশে একটি টিউবয়েলে গিয়ে ভালভাবে ধুয়ে ফেলল এবং সেগুলো ও বারান্দায় ভালভাবে ঢেকে রাখল।

অতঃপর, দিপালী বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাবিবকে ডাকতে লাগল। কিছুক্ষন পর হাবিব তার রুম থেকে বেরিয়ে আসলে দিপালী হাবিবকে নিয়ে সাবিনার রুমে ঢুকল। সাবিনা তখন বিছানায় কাত হয়ে কাঁদছিল। তখন সাবিনার দু' টি ছেলেমেয়ে খালেদ ও রুহানা অশ্রুভরা চোখে মায়ের পাশে বসা।

দিপালী বাচ্ছা দু' টোকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাদের কপালে চুমু খেতে খেতে তাদের মাথায় ও পিঠে হাত বুলায়ে দিতে লাগল। আর তার চোখ বেয়ে ও তখন অনবরত পানি পড়ছিল। অতঃপর, দিপালী আলতোকরে সাবিনার মাথায় হাত দিতেই দীপালীকে জরিয়ে ধরে সাবিনা ধুকরে কেঁদে উঠল। দীপালী সাবিনার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলতে লাগল- 'তুই কাঁদিছ না। আল্লাহ তোর সহায় হবে। তোর মার কথা মনে পরে কিনা দেখ – তোর মা সবসময় বলত, যারা ভাতকে অসম্মান করে, আল্লাহ একদিন তাদেরকে ভাত দিয়েই কষ্ট দেয়।'

পাশে দাঁড়ানো হাবিবের চোখেমুখে তখন ভেসে উঠল ছোটবেলার সেই দৃশ্যগুলো। ছোঠবেলায় মা হাবিব ও ছোট বোন সাবিনাকে মেঝে মাদুর বিছায়ে কিংবা কাঠের তক্তায় বসায় ভাত দিত। হাবিব ও সাবিনার প্লেটে ভাত-তরকারি তুলে দিতে দিতে কত রকমের যে নৈতিক ও শিক্ষামূলক কথা বলত, তার কোন ইয়ত্তা নেই। মা সবসময় বলত – ভাত ফেলবে না। মাটিতে ভাত পড়ে গেলে, তা ধুয়ে খাবে। ভাতকে কখনো অসম্মান করবে না। যারা ভাতকে অসম্মান করে, আল্লাহ তাদেরকে একদিন ভাত দিয়েই কষ্ট দেয়। আর আল্লাহ যখন কাউকে ভাত দিয়ে কষ্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন হাজার কোটি টাকার মালিক হলেও ভাত খাওয়ার কিংবা স্পর্শ করার আর সৌভাগ্য হবে না। পৃথিবীতে অনেক লোক আছে, যাদের সবকিছু আছে এবং কোটি কোটি টাকা আছে, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে এমন কিছু রোগ দিয়েছে যার কারণে তারা খাবার স্পর্শ করতে পারে না। হাবিবের আরও মনে পড়ল, তার প্লেট থেকে মাটিত ভাত পড়ার কারণে ছোটবেলায় মা অনেক বার তার ভাতের প্লেট কেড়ে নিয়েছে এবং যতক্ষন মাটি থেকে ভাতটি তুলে এবং ধুয়ে সে খায়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত ভাতের প্লেট তাকে ফেরত দেয়নি।

মা সবসময় বলতেন - শিক্ষক ও মুরুব্বিদেরকে সব সময় সম্মান করবে। তাদের সাথে কখনো বেয়াদবী করবে না। বিনয় উন্নতির পথে প্রধান সোপান। রাস্তা দিয়ে হেটে যাওয়ার সময়, যদি কখনো মুরুব্বি ধরনের লোক দেখ, তাদেরকে সালাম – নমস্কার বলবে। রাস্তায় যদি কখনো কোন ভিক্ষুক দেখ, তাদেরকে ও সালাম - নমস্কার বলবে। মনে রাখবে - লোভ, হিংসা এবং অহংকার মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে। মানুষকে সম্মান করবে। কাওকে অসম্মান করে, নিজে কখন ও সম্মানিত হতে পারবে না। কেউ যদি তোমাদেরকে চড় মারে কিংবা তোমাদের উপর অন্যায় বা জুলুম করে, তাহলে ও তোমরা কোন প্রতিবাদ করবে না বা প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা ও করবে না। চুপে চুপে ঘরে চলে আসবে। মনে রাখবে, পৃথিবীতে নিরপরাধ মজলুম মানুষের "দীর্ঘশ্বাস" অনেক বেশী শক্তিশালী। সুতরাং, এই অন্যায়ের প্রতিশোধ স্বয়ং স্রষ্টাই নেবে – হয়ত তা হবে খুবই দ্রুত অথবা অনেক দেরিতে অথবা হতে পারে তোমাদের মৃত্যুর পরে। মা আরও বলতেন,"মনে রাখবে, এই পৃথিবীতে তোমরাই সবচেয়ে ছোট, তোমাদের চেয়ে ছোট এই পৃথিবীতে কেউ নেই। এই পৃথিবীতে তোমরাই সবচেয়ে কম বুঝ, তোমাদের চেয়ে কম বোঝার কেউ এই পৃথিবীতে নেই"। জীবনে বড় হয়ে যখন ইংরেজি সাহিত্যের অমর কবি শেক্সপীয়ার-এর সেই মহা মূল্যবান কথাটি হাবিব পড়ে -"তুমি কিছুই জাননা, এটা জানাটাই আসল জ্ঞান", হাবিব তখন অবাক হয়ে চিন্তা করে, মা তো কখনো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়নি এবং শেক্সপীয়ার- এর বই পরার মত ইংরেজি জ্ঞান ও মায়ের ছিল না। কিন্তু সততা ও নৈতিকতার যে জ্ঞান -

প্রজ্ঞার অধিকারী মা ও মায়ের মত সেই পুরোনোদিনের মুরুব্বিদের মধ্যে ছিল, তা তার মত বর্তমান যুগের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হাজারো ছেলেমেয়েদের মধ্যে পাওয়া সহজ নয়।

হাবিবের মনে পড়ে, গ্রামের মুরুব্বিদের উদ্ধৃতি দিয়ে মা একটি কথা প্রায়ই বলতেন, একজন অপরাধী যখন দেখবে যে তুমি তার স্বার্থের পরিপন্থী, তখন সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে তোমাকে দিয়ে কোনো নাকোন ছোট খাটো হলেও বেআইনি কাজ করানোর জন্য। তাতে যদি সে সফল না হয়, তখন তোমাকে যে কোন ধরণের বেআইনি কাজ করতে বাধ্য করার জন্য তোমার চারিদিকে এমনভাবে আগুন জ্বালিয়ে দেবে, যাতে করে সেই আগুনের উত্তাপ তোমার গায়ে লাগে। আর সেই আগুন থেকে বাঁচার জন্য, তুমি ছোট খাটো কোনো অপরাধ ও যদি কখন ও কর, তাহলে মনে রাখবে, এই ছোট অপরাধই তোমার জীবনের সর্বনাশের কারন হয়ে দাঁড়াবে। যেই অপরাধী তোমাকে যে কোন ধরণের অপরাধ করতে বাধ্য করার জন্য তোমার চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, সেই এখন তোমার সেই ছোট বেআইনি কোনো কাজকে পুঁজি করে বড় ধরণের কোন অপরাধ করতে বাধ্য করবে এবং শেষ পর্যন্ত তোমার জীবনটাকে চিরদিনের জন্য অপরাধের কাদায় জড়ায়ে তার স্বার্থ উদ্ধার করবে। সুতরাং, জীবনে যত বিপর্যয়ই আসুক না কেন, সত্যের পথ থেকে কখন বিচ্যুত হবে না। সত্য, ন্যায় নিষ্ঠা এবং আইনের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা বোধই তোমাদের জীবনে কল্যান বয়ে আনতে পারে।

অতঃপর দীপালি হাবিবকে বলল – তুই ও এখন বুঝতে পারতেছিস যে তোর স্ত্রী কুলসুমের কারণে সাবিনার পক্ষে এই বাড়িতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা সম্ভব নয়, তাই সাবিনাকে আমি নিয়ে যাব। মালয়েশিয়া থেকে তার স্বামী আসতে যত বছরই লাগুক, তত বছর সে তার সন্তানদেরকে নিয়ে আমার সাথে থাকবে। হাবিব ও উপলব্ধি করতেছিল যে তার স্ত্রী তার বোন সাবিনাকে এই বাড়িতে থাকতে দেবে না। তাই সাবিনাকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সে আর কোন বাধা দিল না।

দীপালী যখন সাবিনা ও তার দু' সন্তানদেরকে সঙ্গে নিয়ে মালপত্রসহ বেরিয়ে যাচ্ছিল, সে সময় হাবিব দীপালির পা ধরে কিছু বলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। আর দীপালী তখন হাবিবের মাথায় হাত বুলিয়ে সাবিনাদেরকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সেদিন রাতে দীপালি, সাবিনা ও অন্যান্যরা যখন ড্রয়িং রুমে বসা, তখন রাত ৮ টার সংবাদে “মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ড সীমান্ত এলাকায় ১৩৯টি গণকবর ও ২৮টি টর্চার ক্যাম্পের (বন্দীশিবির) সন্ধান পেয়েছে মালয়েশিয় পুলিশ” শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় –

“প্রতিবেদন তারিখঃ ২৫ মে, ২০১৫: মালয়েশিয় পুলিশ মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ড সীমান্ত এলাকায় ১৩৯টি গণকবর ও ২৮টি টর্চার ক্যাম্প বা বন্দীশিবিরের সন্ধান পেয়েছে। মালয়েশিয়ার পুলিশ প্রধান জানান, মে মাসের ১১ থেকে ২৩ তারিখের মধ্যে বন্দীশিবির ও কবরগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এসব গণকবরে কতটি মৃতদেহ আছে তা জানানো হয়নি। এর আগে মালয়েশিয়ার সংবাদ মাধ্যম ১০০টি লাশ উদ্ধারের কথা জানিয়েছিল। পুলিশ প্রধান জানিয়েছেন, কোনো কোনো কবরে একাধিক লাশ রয়েছে। এ ছাড়া কোনো বন্দীশিবিরে একসঙ্গে ৩ শ' য়েরও বেশি লোককে রাখার মতো জায়গা রয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, মানবপাচারকারীরা বাংলাদেশি ও মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের ওই বন্দীশিবিরগুলোতে রাখত এবং লাশগুলো তাদেরই। পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, বন্দীশিবির ও কবর পাওয়ার ঘটনার তদন্তকালে মানবপাচারের সঙ্গে জড়িত বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকও মানবপাচারের সঙ্গে জড়িতদের আটকের ঘোষণা দিয়েছেন। বেশ কিছুদিন আগে মালয়েশিয়ার উত্তরের পারলিস প্রদেশের পাশে অবস্থিত থাইল্যান্ডের সঙ্খলা প্রদেশে মানবপাচারকারীদের ব্যবহৃত ১৭টি নির্যাতন শিবির ও ২৬টি লাশ খুঁজে পায় দেশটির পুলিশ। এ ঘটনার পর থাই পুলিশ মানবপাচারের সঙ্গে জড়িতদের ধরতে অভিযান শুরু করে।

মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া উপকূল থেকে এ পর্যন্ত তিন হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এই প্রথম থাইল্যান্ডের বাইরে পাচার হওয়াদের কবর ও বন্দীশিবিরের সন্ধান পাওয়া গেল। থাইল্যান্ড সীমান্তের কাছে মালয়েশিয়ার উত্তরাঞ্চলে মানবপাচারকারীদের পরিত্যক্ত আস্তানায় সব মিলিয়ে ১৩৯টি গণকবরের সন্ধান পেয়েছে দেশটির পুলিশ। মালয়েশিয়া পুলিশের মহাপরিদর্শককে উদ্ধৃত করে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত দুই সপ্তাহ ধরে অভিযান চালিয়ে তার বাহিনীর সদস্যরা এসব কবর চিহ্নিত করেছে, যার কোনো কোনোটিতে একাধিক দেহাবশেষ থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত ১ মে থেকে থাই সীমান্তের ৫০০ মিটার উত্তরে ২৮টি পরিত্যক্ত ক্যাম্পে এসব কবর পাওয়া গেছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন মালয়েশিয়া পুলিশের মহাপরিদর্শক। এর মধ্যে একটি গণকবরের অবস্থান গতমাসে থাইল্যান্ডে পাওয়া কবর থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে। কবরগুলো থেকে দেহাবশেষ তোলার কাজ চলছে বলে মালয়েশীয় পুলিশ প্রধান জানিয়েছেন। এক মাস আগে থাইল্যান্ডের সংখলা প্রদেশের পাহাড়ি এলাকায় পাচারকারীদের ক্যাম্পে ওই গণকবরে ২৬টি দেহাবশেষ পাওয়া পরই সাগরপথে মানবপাচারের বিষয়টি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনায় আসে। ধারণা করা হয়, বিভিন্ন স্থান থেকে অভিবাসন প্রত্যাশীদের নৌকায় করে প্রথমে আনা হয় থাইল্যান্ডে। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে পাচারকারীদের বিভিন্ন ক্যাম্পে তাদের রাখা হয়। পরে সময় সুযোগ মতো তাদের আবার নৌকায় করে অথবা স্থলপথে মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়ায় পাঠানো হয়।" *(সূত্র: দৈনিক পূর্বকোণ)*

সংবাদটি শোনার সাথে সাথে এক অজানা আশংকায় সাবিনার কলিজাতি যেন মোচড় দিয়ে উঠল এবং সে সাথে সাথে দালালের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল। কিন্তু, দালাল সাবিনাকে তার স্বামীর অবস্থান সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারলনা। তারপর সাবিনা বুঝতে পারে যে, তার স্বামী বড়ধরনের কোনো বিপদে পড়েছে।

দীপালির এক ছেলে ও এক মেয়ে। দীপালির মেয়ে রুনা তার স্বামী সহ গাজীপুরে "বাংলাদেশ অ্যাপারেলস লিমিটেড" নামে একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে সুইং অপারেটর হিসেবে কাজ করে।

রুনার দেড় বছর বয়সী অঞ্জলি নামে একটি মেয়ে আছে। রুনা ও তার সহকর্মী স্বপ্না ফ্যাক্টরীর কাছে পাশাপশি দু' টি ভাড়া বাড়িতে থাকে। রুনা হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং স্বপ্না মুসলিম। স্বপ্নার ময়ূরী নামে ছয় মাসের একটি মেয়ে আছে।

রাত্রে দীপালি সাবিনার সব দুঃখের কথাগুলো তার মেয়ে রুনাকে বলল। দিপালী এবং হাফিজার বাল্য বন্ধুত্বের কারণে দুই পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিক ও গভীর সম্পর্ক ছিল। সাবিনার দুঃখের কাহিনীগুলো শোনার পর, রুনা কাঁদতে কাঁদতে তার মা দিপালীকে বলল - "মা! তুমি চিন্তা করো না। সাবিনাকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে তার জন্য একটি চাকুরির ব্যবস্থা করব। তাকে ভালভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে, আমি তাকে একজন দক্ষ পোশাক শিল্পী হিসেবে গড়ে তুলব। আমি যদি তাকে একজন দক্ষ অপারেটর হিসেবে গড়ে তুলতে পারি, তাহলে সে কমপক্ষে দশ / বার হাজার টাকা বেতন পাবে। আর সে যদি ব্লাইন্ড স্টিৎচ, সাইড স্লিত, বাক্স, নেক্টেকজন্ট সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রসেসগুলোর কন্ট্রাক্ট-অপারেটর হিসেবে কাজ করে, তাহলে সে পনের থেকে বিশ হাজার টাকা প্রতি মাসে উপার্জন করতে পারবে। সাবিনা দেশে থেকে গার্মেন্টসে চাকুরি করে তার সন্তানদেরকে লেখাপড়া করায়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারবে। এভাবে সাবিনা প্রতি মাসে যত টুকু দেশে থেকে টাকা উপার্জন করতে পারবে, হয়ত এর অর্ধেক টাকা ও সাবিনার স্বামীর পক্ষে মালয়েশিয়া থেকে পাঠানো সম্ভব হবে না। অথচ, জীবনের সব সহায়- সম্বলটুকু বিক্রি করে পুরো পরিবারটিকে পথে বসায়ে দিয়ে, সে গেছে অবৈধ পথে মালয়েশিয়াতে পরিবারের জন্য সোনার হরিণ ধরতে।

পরদিন, সকালে দীপালি সাবিনা ও তার দুই সন্তানদেরকে নিয়ে রুনার বাড়ীতে চলে আসল। রুনার ঘরে দুটি বেড রুম আছে। একটি বেডরুমে রুনারা থাকে। অন্যটি গেস্ট রুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেদিন রাত ৮.৩০ মিনিটের দিকে রুনা এবং স্বপ্না ফ্যাক্টরী থেকে বাসায় ফিরে। কলিং বেলটা বেজে উঠতেই সাবিনা দরজা খুলে দিল। সাবিনাকে দেখার সাথে সাথে, রুনা সাবিনাকে জড়িয়ে ধরল। রুনা সাবিনাকে বলল – তুই আর চিন্তা করিস না। আজ থেকে তুই আমার সাথে থাকবি, সারা জীবন থাকবি। এতদিন আমার মায়ের একটি মেয়ে ছিলাম, আজ থেকে আমার মায়ের তুই আর আমি দু' টি মেয়ে।

খালি রুমটি দেখায়ে রুনা সাবিনাকে বলল, এই তোর শোবার ঘর। রাতে রুনার সহকর্মী স্বপ্না রুনার বাসায় আসল। রুনা স্বপ্নাকে সাবিনার দুঃখের কাহিনী গুলো বলল। সেগুলো শুনে স্বপ্নার মনটা একেবারে মোচড় দিয়ে উঠল।

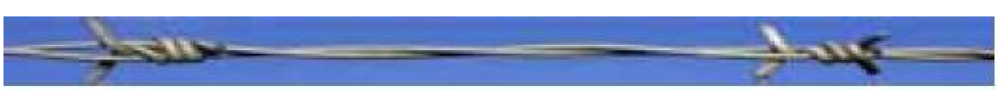

=২=

আন্দামান সাগরে নৌকা ডুবিতে অনেক লোকের প্রানহানি হয়। কিন্ত, সৌভাগ্যক্রমে সাবিনার স্বামী সালমান সহ মাত্র কয়েকজন আন্দামান দ্বীপের তীরের দিকে সাঁতরে বেঁচে যায়। অতঃপর আন্দামান দ্বীপে সালমান এবং তার অন্যান্য সাথীদের দুঃখ আর হতাশার কোন সীমা রইলনা। সেখানে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সালমানের তখন নিজেকে এক "জিন্দালাশ" মনে হচ্ছিল।

এটা ছিল অন্যরকম এক জীবন। গতানুগতিক জীবন ধারা থেকে অনেক দুরে ছিটকে পড়ে গিয়ে নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আজ সে অনেক দূরে। সেখানে তার দুচোখের পানিই তার একমাত্র সাথী। তার মনে হয়, অনাহারে – অর্ধাহারে আন্দামান দ্বীপের বন-জঙ্গলে তার কান্নাই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তার মনে পড়ে, একটি বাচ্চা পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম যে ঘটনাটি ঘটে তা হচ্ছে "শিশূটির কান্না"। শিশূটির এই কান্না তার সুস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্তপূর্ণ। কারণ শিশুটি মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পরপরই জীবনে প্রথমবারের মত তার ফুসফুসে কিছু বাতাস নেওয়ার প্রয়োজন হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম কান্নার মাধ্যমে শিশুটি এই প্রথম তার ফুসফুসে কিছু বাতাস গ্রহন করে। আর এই জন্যই একটি বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি না কাঁদে, তাহলে বাচ্চাটির পায়ে সামান্য চিমটি কেটে হলে ও তাকে কান্না করাতে হয়। আন্দামান দ্বীপের বন-জঙ্গলে সে প্রতিদিন একটি বটগাছের নিচে বসে হারানো জীবনের স্মৃতিগুলো হাতড়িয়ে বেড়ায়। তার স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তগুলো তার মনে পড়ে। তার মনে পড়ে সেই গানঃ

আমার সোনা বন্ধুরে, তুমি কোথায় রইলারে
শিল্পীঃ মুজিব পরদেশী
সুরকারঃ মুজিব পরদেশী
গীতিকারঃ মুজিব পরদেশ

আমার সোনা বন্ধুরে, তুমি কোথায়
রইলারে।।
দিনে রাইতে তোমায় আমি।।
খুঁইজা মরিরে....
আমার সোনা বন্ধুরে, তুমি কোথায়
রইলারে।।
প্রথম দেখার কালে বন্ধু কথা
দিয়েছিলে।।
ভুলিবেনা মোরে, এই জীবন গেলে।।
যদি না পায় তোমারে, আমার জীবনের
তরে।।
সোনার জীবন অঙ্গার হইব।।

তোমার লাইগারে . . . .
আমার সোনা বন্ধুরে, তুমি কোথায়
রইলারে।।
ভুলতে পার বন্ধু তুমি, আমি ভুলি নাই।।
মরণকালে যেন বন্ধু, একবার তোমায় পাই।
পরকালে যেন বন্ধু, একবার তোমায় পাই।
যদি না পায় সেকালে, প্রেম যাইবে
বিফলে।।
তখন কিন্তু বলব আমি।।
প্রেম কিছুই নারে . . . .
আমার সোনা বন্ধুরে, তুমি কোথায়
রইলারে।।
আমার সোনা বন্ধুরে, তুমি কোথায়
রইলারে.........#

অতীত জীবনে সাবিনার স্বামি সালমান অসংখ্য বার "Hopeless People" বা "আশাহীন মানুষ" শব্দগুলো শুনেছে। কিন্তু "আশাহীন মানুষ" – এর অপর নাম যে "জিন্দালাশ" বা "বেঁচে থেকে ও মৃত", তা আন্দামান দ্বীপের জঙ্গলে জীবন এবং মৃত্যুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে সে জীবনে এই প্রথম বার তা অণুধাবন করল। মাঝে মাঝে মনের অজান্তেই তার ডান হাতটাকে পিছনের দিকে প্রসারিত করে, তার জীবনটা কোথায় হারিয়ে গেল, তা হাতড়ানোর চেষ্টা করে। যখনই সে কোনো বিমান আকাশে পশ্চিম দিকে উড়ে যেতে দেখত, তখন তার মনে হত, হয়ত এই বিমানটি তার দেশের এয়ারপোর্টে অবতরণ করবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বিমানে করে দেশে যাওয়ার জন্য তার কোন পাসপোর্ট ও নেই, ট্রাভেল ডকুমেন্ট ও নেই। সালমানের মনে পড়ে -

প্রতীক্ষা
শিল্পীঃ ওয়ারফেজ
অ্যালবামঃ সত্য

দুঃস্বপ্নের শেষ সীমানায়, চমকে ঘুম ভেঙ্গে যায়
জেগে দেখি তুমি পাশে নাই, চোখ পড়ে খোলা জানালায়
জোছনায় আলো নেই আর, হতাশার কালো আঁধার
নির্বাক রয় ধরণী, দুঃখ যেনো আমারই
এক ঝিম-ধরা দিবা স্বপনে, আনাগোনা সন্দেহে
আমি একা মেতে উঠি, পুণ্যে বিকশিত
পাপের খেলায়, কারাগারের অবহেলায়
পচন ধরে এ মনে, শরীরে

কবে আসবে ফিরে ভালোবাসা
জীবনের সব আশায়, হতাশার আলিঙ্গনে
ঘুণে ধরা স্বপ্নগুলো, সব যেনো এলোমেলো
স্মৃতি নিয়ে আমি একা, ভাসমান এই জীবন
তাই বুঝি বেঁচে থাকা, জানিনা এর শেষ কোথায়
এক গোলক ধাঁধাঁয় আটকে পড়া, অবনত হৃদয়ে
দিশেহারা ছুটি আমি, রাতের আলোকিত, নগর প্রণয়,
ভালোবাসার প্রতারণায়, পচন ধরা বিশ্বাসে, আশায়…

আন্দামান দ্বীপের এই নির্জন জঙ্গলে সে জীবনে এই প্রথম বার বুঝতে পারল, **"Hope" only "Hope" and "dream" only "dream", "আশা" শুধুমাত্র "আশা" এবং "স্বপ্ন" শুধুমাত্র "স্বপ্ন"** –ই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। জীবনে এই প্রথম বার বুঝতে পারল, **"আশা"** এবং **"স্বপ্ন"**- এই শব্দগুলোর মধ্যে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার একটি বিরাট শক্তি নিহিত আছে। আর এর সাথে তার দু' চোখ দিয়ে অনবরত গড়িয়ে পড়া অশ্রুধারা তার বুকের ভিতর জমাটবদ্ধ হয়ে থাকা কষ্টের পাথরগুলোকে কিছুটা হালকা করে দিচ্ছে। আর এই দু:খের সাগরে যে কয়টি গান তাকে কিছুটা সান্তনা দিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে –"একবার যেতে দে না আমার ছোট সোনার গাঁয়' ।

একবার যেতে দে না
শিল্পীঃ শাহনাজ রহমত উল্লাহ
সুরকারঃ আনোয়ার পারভেজ
গীতিকারঃ গাজী মাজহারুল আনোয়ার

একবার যেতে দে না
আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়।
যেথায় কোকিল ডাকে কুহু
দোয়েল ডাকে মুহু মুহু
নদী যেথায় ছুটে চলে
আপন ঠিকানায়।

পিদিম জ্বালা সাঁঝের বেলা
শান বাঁধানো ঘাটে।
গল্প কথার পানশী ভিড়ে
রুপ কাহিনীর বাটে।
মধুর মধুর মায়ের কথায়
প্রান জুড়িয়ে যায়।

ফসল ভরা স্বপ্ন ঘেরা
পথ হারানো ক্ষেতে।
মৌ মৌ মৌ গন্ধে যেথায়
বাতাস থাকে মেতে।
মমতারই শিশিরগুলো
জড়িয়ে থাকে পায়।

=৩=

রুনা ও স্বপনার আপ্রান প্রচেষ্টায়, সাবিনা হেল্পার হিসেবে তার কাজের পাশাপাশি প্লেইন মেশিন, ওভারলক, ফ্লাটলক, বাটন হোল, বাটন স্টীচ এমনকি ফীড অব দ্য আরম মেশিনের কাজগুলু খুব দ্রুততার সাথে শিখে ফেলে এবং এগুলোর পাশাপাশি গার্মেন্টস- এর সব ক্রিতিক্যাল প্রসেসগুলো খুব দ্রুত শিখে ফেলার চেষ্টা করে। তার টিপ্পিং কলারের এন্ড-থ্রেড ইনসার্টের নৈপুণ্য দেখে প্রডাকশনের সব সিনিয়ররাই মুগ্ধ। আর তার জীবন যুদ্ধের করুন কাহিনী শূনে তাকে সব সিনিয়ররাই নিজ সন্তানের মত স্নেহ করেন।

ফ্যাক্টরীতে হেল্পার হিসেবে যোগদানের ছয় মাসের মাথায় সাবিনা অপারেটর হয়ে গেল। এই ছয় মাসের মধ্যে সে গভীরভাবে উপলব্দি করল যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী শুধু পোশক তৈরির কারখানা নয়। এই ফ্যাক্টরী প্রযুক্তি, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক মূল্যবোধ ও নিরাপত্তা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ ও অনুশীলন করার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য ফ্যাক্টরীতে একজন সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে একটি ডে-কেয়ার রুম আছে। সকালে ফ্যাক্টরীতে আসার সময়, রুনা ও স্বপনা তাদের বাচ্চাদেরকে ও নিয়ে আসে। বাচ্চাদের দুধ খাওয়ার যখন সময় হয়, তখন হয় রুনা নতুবা স্বপনা ওরা যেকোন একজন এসে বাচ্চা দুটোকে দুধ খাওয়ায়ে যায়। আবার দুধ খাওয়ানোর সময়ও রুনা প্রথমে স্বপনার বাচ্চাটিকে দুধ খাওয়ায়। আবার স্বপনা যখন বাচ্চাদেরকে দুধ খাওয়াতে আসে, তখন স্বপনা প্রথমে রুনার বাচ্চাটিকে দুধ খাওয়ায়। রুনা ও স্বপনা দুজন দুই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অকৃত্রিম ভালভাসা ও আন্তরিকতার বন্ধন ফ্যাক্টরীর প্রত্যেকের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি অনণ্য মডেল হিসেবে প্রশংসিত।

সাধারণতঃ প্রতিদিন দুপুর ১২ টা এক মিনিটে পিএ সিস্টেমের মাধ্যমে ফ্যাক্টরীর প্রডাকশন ফ্লোরগুলোতে **"একটি বাংলাদেশ, তুমি জাগ্রত জনতার, সারা বিশ্বের বিস্ময়, তুমি আমার অহংকার"** গানটি বেজে উঠে।

শিল্পীঃ সাবিনা ইয়াসমিন
সুরকারঃ অজিত রায়
গীতিকারঃ নাইম গওহর

একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতার
সারা বিশ্বের বিস্ময় তুমি আমার অহংকার।

তোমার স্বাধীনতা গৌরব সৌরভে
এনেছে আমার প্রানের সূর্যে রৌদ্রেরও সজীবতা
দিয়েছে সোনালী সুখী জীবনের দৃপ্ত অঙ্গীকার।
সারা বিশ্বের বিস্ময় তুমি আমার অহংকার।
তোমার ছায়া ঢাকা রৌদ্রেরেরও প্রান্তরে

রেখেছি অতল অমর বর্নে মুক্তির স্নেহ মাখা
জেনেছি তুমি জীবন মরণে বিমুগ্ধ চেতনার।
সারা বিশ্বের বিস্ময় তুমি আমার অহংকার।

এই গানটির পর ১২ টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত আর ও বেশ কিছু দেশাত্মবোধক গান বাজতে থাকে। দেশাত্মবোধক প্রতিটি গান রুনা, স্বপ্না ও সাবিনাদের মনে দেশের জন্য কিছু করার দৃঢ় প্রত্যয় জাগ্রত করে। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে বর্তমানে যে পয়তাল্লিশ লক্ষ মানুষ গার্মেন্টস শিল্পে সরাসরি নিয়োজিত আছে, তারা যদি অকৃত্রিম ভালবাসা নিয়ে দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে, তাহলে গার্মেন্টস পণ্যের বর্তমান সময়ের ২৬ কিংবা ২৭ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানির পরিমাণ আগামী দশ / বার বছরের মধ্যে ৫০ / ৬০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তবে এটার জন্য প্রয়োজন সমগ্র জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন। গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত প্রতিটি মানুষ যদি মনেপ্রানে বিশ্বাস করে, যে মাস শেষে শুধুমাত্র কিছু বেতন পাওয়ার জন্য ওরা কাজ করতেছে না, বরং দেশের জন্য এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ওরা আজকে পরিশ্রম করে যাচ্ছে, তাহলে এই গার্মেন্টস শিল্প ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশেকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

প্রতিদিন ফ্যাক্টরির প্রডাকশন ফ্লোরে দুপুর দু' টা ত্রিশ মিনিটে কালজয়ী গীতিকার গোবিন্দ হালদার রচিত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সেই ঐতিহাসিক গানটি 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি' বেজে উঠে।

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি

কণ্ঠঃ আপেল মাহমুদ
গীতিকারঃ গোবিন্দ হালদার
সুরকারঃ আপেল মাহমুদ

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি
যে মাটির চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা
যার নদী জল ফুলে ফলে মোর স্বপ্ন আঁকা
যে দেশের নীল অম্বরে মন মেলছে পাখা
সারাটি জনম সে মাটির দানে বক্ষ ভরি
মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি
মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি
যে নারীর মধু প্রেমেতে আমার রক্ত দোলে
যে শিশুর মায়া হাসিতে আমার বিশ্ব ভোলে
যে গৃহ কপোত সুখ স্বর্গের দুয়ার খোলে
সে শান্তির শিবির বাঁচাতে শপথ করি

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি

রুনা, স্বপ্না ও সাবিনারা যখন এই গানটি শুনে, তখন তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠে নতুন এক স্বপ্ন, তাদের বুকের মধ্যে জেগে উঠে নতুন এক দৃঢ় প্রত্যয়, নতুন এক প্রতিজ্ঞা –" বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সাথে আমরা পয়তাল্লিশ লক্ষ মানুষ সরাসরি জড়িত, আমরা ও নতুন করে একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করতে পারি, আমরা ও নতুন করে একটি মুখে হাসি ফোটানোর জন্য যুদ্ধ করতে পারি, এই যুদ্ধ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সোনালী বাংলাদেশ নির্মাণ করার জন্য যুদ্ধ, এই যুদ্ধ দেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধা-দারিদ্রপীরিত অসহায় নর-নারীর মুখে হাসি ফোটানোর জন্য যুদ্ধ।"

প্রডাকশন ফ্লোরের আরেকটি প্রিয় গান হচ্ছে – শিল্পী হায়দার হোসেনের"তিরিশ বছর পর' গানটিঃ

তিরিশ বছর পর
গীতিকার, সুরকার, শিল্পী হায়দার হোসেন

কী দেখার কথা, কী দেখছি? কী শোনার কথা, কী শুনছি?
কী ভাবার কথা, কী ভাবছি? কী বলার কথা, কী বলছি?
তিরিশ বছর পরেও আমি স্বাধীনতাটাকে খুঁজছি।

স্বাধীনতা কি বৈশাখী মেলা, পান্তা ইলিশ খাওয়া?
স্বাধীনতা কি বটমূলে বসে বৈশাখী গান গাওয়া?
স্বাধীনতা কি বুদ্ধিজীবীর বক্তৃতা-সেমিনার?
স্বাধীনতা কি শহীদ বেদীতে পুষ্পের সমাহার?
স্বাধীনতা কি গল্প নাটক উপন্যাস আর কবিতা?
স্বাধীনতা কি আজ বন্দি আনুষ্ঠানিকতা?

স্বাধীনতা কি ঢাকা শহরের আকাশচুম্বী বাড়ি?
স্বাধীনতা কি ফুটপাতে শোয়া গৃহহীন নর-নারী?
স্বাধীনতা কি হোটেলে হোটেলে গ্র্যান্ড ফ্যাশন শো?
স্বাধীনতা কি দুখিনী নারীর জড়-জীর্ণ বস্ত্র?

স্বাধীনতা কি গজিয়ে ওঠা অভিজাত পান্থশালা?
স্বাধীনতা কি অন্নের খোঁজে কিশোরী প্রমোদবালা?
স্বাধীনতা কি নিরীহ লোকের অকারণে প্রাণদণ্ড?
স্বাধীনতা কি পানির ট্যাংকে গলিত লাশের গন্ধ?

স্বাধীনতা কি হরতাল ডেকে জীবন করা স্তব্ধ?
স্বাধীনতা কি ক্ষমতাহরণে চলে বন্দুকযুদ্ধ?
স্বাধীনতা কি সন্ত্রাসী হাতে মারণাস্ত্রের গর্জন?
স্বাধীনতা কি অর্থের লোভে বিবেক বিসর্জন?

আজ নেই বর্গী, নেই ইংরেজ, নেই পাকিস্তানি হানাদার,
আজো তবু কেন আমার মনে শূণ্যতা আর হাহাকার?
আজো তবু কি লাখো শহীদের রক্ত যাবে বৃথা?
আজো তবু কি ভুলতে বসেছি স্বাধীনতার ইতিকথা?

প্রডাকশন ফ্লোরের আরেকটি প্রিয় গান হচ্ছে –

তোমার পথ আমার পথ

শিল্পী - রুনা লায়লা ও সাবিনা ইয়াসমিন।
শিল্পীঃ ওয়ারফেজ
অ্যালবামঃ সত্য
বছরঃ ২০১২

" **তোমার** পথ আমার পথ ভিন্ন হতে পারে
তোমার মত আমার মত ভিন্ন হতে পারে
তবু এক পৃথিবীর মানুষ আমরা, জীবন তো একটাই,
এই জীবনটাকে ভালবাসার উর্দ্ধে নিতে চা....ই "। (২)

"স্বপ্ন দেব শিশুর চোখে, বন্ধু হব তার
অসহায়ের পাশে দাঁড়াব আমরা বারে বার "। (২)

তোমার গান আমার গান ভিন্ন হতে পারে
তোমার প্রাণ আমার প্রাণ ভিন্ন হতে পারে
তবু এক পৃথিবীর মানুষ আমরা, জীবন তো একটাই,
এই জীবনটাকে ভালবাসার উর্দ্ধে নিতে চা....ই।

"এই মাটিতেই জন্ম আমার ভালোবাসি দেশ
কোটি হৃদয় ছুঁয়ে থাকুক গানের এই আবেশ "। (২)

তোমার সুখ আমার সুখ ভিন্ন হতে পারে,
তোমার দুখ আমার দুখ ভিন্ন হতে পারে;

" তবু এক পৃথিবীর মানুষ আমরা, জীবন তো একটাই,
এই জীবনটাকে ভালবাসার উর্দ্ধে নিতে চা....ই "। (৩)

রুনা, স্বপ্না ও সাবিনারা এই গানের মধ্যে বিশ্ব শান্তি-সৌহার্দের এক অসাধারণ মর্মার্থ খোজে পায়। প্রডাকশন ফ্লোরের আরেকটি প্রিয় গান হচ্ছে –

মানুষ মানুষের জন্য
সুরকারঃ ভূপেন হাজারিকা
গীতিকারঃ ভূপেন হাজারিকা

মানুষ মানুষের জন্য
জীবন জীবনের জন্য
একটু সহানুভূতি কি
মানুষ পেতে পারে না… ও বন্ধু।।

মানুষ মানুষকে পণ্য করে,
মানুষ মানুষকে জীবিকা করে,
পুরোনো ইতিহাস ফিরে এলে
লজ্জা কি তুমি পাবে না… ও বন্ধু।।

বলো কি তোমার ক্ষতি
জীবনের অথৈ নদী
পার হয় তোমাকে ধরে
দুর্বল মানুষ যদি।

মানুষ যদি সে না হয় মানুষ
দানব কখনো হয় না মানুষ
যদি দানব কখনো বা হয় মানুষ
লজ্জা কি তুমি পাবে না… ও বন্ধু।।

=৪=

প্রতিদিন ফ্যাক্টরি থেকে বাসায় ফেরার পর খাওয়া-দাওয়া শেষে, রুনা, স্বপ্না ও সাবিনা অন্তত এক দেড় ঘণ্টা দেশ, সমাজ, অর্থনীতি, শিল্পনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কারিগরী প্রশিক্ষন, আইটি টেকনলজি, বিশেষ করে দেশের যে সকল জ্ঞানী-গুনি, বিজ্ঞানী, শিল্পপতি ও মেধাবি তরুণরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখছেন, সেগুলো নিয়ে গল্প-স্বল্প করে সময় কাটায়। তাদের একমাত্র স্বপ্ন, তাদের একমাত্র ভালবাসা, "দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, দেশ এগিয়ে যাক, বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে, বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় সুখী- সমৃদ্ধিশালী আদর্শ দেশ হিসেবে চিরকাল বেঁচে থাক"। তাদের আলোচনায় বেশী প্রাধান্য পায় দেশের উন্নয়নের কথা, দেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধা-দারিদ্রপীরিত অসহায় নর-নারীর কথা। তাদের স্বপ্ন, তাদের আশা – আজকের বাংলাদেশের ষোল কোটি মানুষের বত্রিশ কোটি হাত বাংলা মায়ের এক গর্ভের সন্তান হয়ে হাতে-হাত মিলায়ে, কাঁধে কাঁধ মিলায়ে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এমন একটি "সোনালী বাংলাদেশ" নির্মাণ করবে যেখানে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কবি গুরু রবীন্দ্র নাথের "সোনার বাংলা" কিংবা পল্লী কবি জসীম উদ্দীনের গ্রাম বাংলার প্রতিচ্ছবি খোজে পাবে।

ওরা এমন একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে যেখানে কোন বাবা-মায়ের তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না, তাদের চিন্তা করতে হবে না – ভবিষ্যতে তাদের সন্তানরা কি খাবে, কি পরবে, কিভাবে চলবে কিংবা কোথায় যাবে। তারা চিন্তা করে - আজকের বাংলাদেশের ষোল কোটি মানুষের বত্রিশ কোটি হাত যে "সোনালী বাংলাদেশ" নির্মাণ করবে সেই "সোনালী বাংলাদেশই" তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে, নিজ গর্ভের সন্তানের মত বাবা-মায়ের অকৃত্রিম ভালবাসা ও আদর-সোহাগ দিয়ে আগলে রাখবে।

ফ্যাক্টরীতে প্রতিমাসে অন্তত একবার করে ফায়ার ড্রিল হয়। ফায়ার ড্রিলের সময় সেন্ট্রাল ফায়ার কন্ট্রোলের মাধ্যমে ফায়ার এলার্ম বেজে উঠার সাথে সাথে ফ্যাক্টরীর সব সেকশনের লোকজন সুশৃঙ্খলভাবে বেরিয়ে এসে ফ্যাক্টরীর সামনে এসেম্বলী এরিয়াতে সমবেত হয়। সেন্ট্রাল ফায়ার কন্ট্রোল বোর্ডে এলার্মিং সিস্টেমটি এমনভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে যে সেন্ট্রাল ফায়ার কন্ট্রোল বোর্ডে পুরো ফ্যাক্টরীটিকে প্রতিটি সেকশন অনুযায়ী মোট ১২ টি জোনে ভাগ করা হয়েছে এবং পুরো ফ্যাক্টরীর প্রতিটি প্রয়োজনীয় জায়গায় স্থাপিত স্মোক ডিটেকটরগুলো এই ফায়ার কন্ট্রোল বোর্ডের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। যখন কোন সেকশনে কিংবা কোন জোনে কোন স্মোক ডিটেকটর ধোয়া সনাক্ত করে, তখন সর্ব প্রথম ওই সেকশনে কিংবা ওই জোনে ফায়ার এলার্ম বেজে উঠবে। এর পর পর অন্য সেকশন কিংবা অন্য জোনগুলোতে পর পর অনবরত ফায়ার এলার্ম বাজতে থাকবে। এই সুবিন্যস্ত, ফায়ার কন্ট্রোল ও এলার্মিং সিস্টেমের কারণে কোন ধরনের অগ্নি দুর্ঘটনার সময় সব সেকশনের লোকজন একসাথে বেরিয়ে আসতে গিয়ে কিংবা সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে হুরুহুরিতে মৃত্যুর যে ঝুকি অনেক বেশি থাকে, তা এখানে থাকে না।

প্রতিটি ফায়ার ড্রিলের ঐ সমাবেশে ফ্যাক্টরীর জিএম অপারেশন দশ মিনিট করে বক্তব্য প্রদান করেন। তার বক্তব্যে ফ্যাক্টরীতে কর্মরত অবস্থায় কিভাবে নিজেকে, নিজের সহকর্মীদেরকে তথা পুরো ফ্যাক্টরীকে নিরাপদ রাখা যায়, সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোকপাত করেন। এর পাশাপাশি, তিনি দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও গার্মেন্টস শিল্প সহ বিভিন্ন শিল্পখাতের সোনালী সম্ভাবনার কথাগুলো ও সকল শ্রমিক-

কর্মচারীদের মধ্যে তুলে ধরেন। একদিন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন অবলম্বনে সম্পাদিত তার একটি লিখা শ্রমিক -কর্মচারীগণ নিজ উদ্দ্যোগে বড় কাগজে প্রিন্ট করে ফ্যাক্টরির দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়।

অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

আজ থেকে ৫৫ বছর আগে ১৯৬০ সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ছিল - মাত্র ৩ বিলিয়ন বা ৩ শ কোটি। আর ২০১৬ সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৫ বিলিয়ন বা ৭ শ ৫০ কোটি, মাত্র ৫৫ বছর আগের জনসংখ্যার দু'গুণের ও বেশি । গবেষকদের ধারণা হচ্ছে, আমাদের এই পৃথিবীর বয়স সাড়ে চার শ কোটি বছর। আর পৃথিবীতে মানব অস্তিত্বের সূচনা হয়েছিল ৬০ লাখ বছর আগে এবং আধুনিক মানব জাতির যাত্রা শুরু হয়েছিল দুই লাখ বছর আগে। সেই তখন থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ১ শ ৬০ কোটি এবং বিংশ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়াল ৬ শ ১০ কোটি - অর্থাৎ হাজার কোটি বছরে যেখানে জনসংখ্যা দাঁড়াল ১ শ ৬০ কোটি, আর তা মাত্র ১০০ বছরে বেড়ে গেল ৪৫০ কোটি। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৫০ সালে বিশ্বে জনসংখ্যা দাঁড়াবে নয় বিলিয়ন বা ৯ শ কোটি।

জাতিসংঘের তথ্য মতে, ২০৫০ সাল নাগাদ খাদ্যের চাহিদা ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। গবেষকরা বলেন, বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিরুপ জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে এবং ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে এখন থেকে যদি প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া না হয়, তাহলে ২০৪০ -২০৫০ সালের দিকে বিশ্বে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের কারণে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার আশংকা আছে এবং সেই পরিস্থিতি প্রায় দু'কোটি ৪০ লাখ শিশুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে।

বর্তমান বিশ্বে আইএলও মানদণ্ড অনুযায়ী স্বীকৃত অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় মোট শ্রমশক্তি হচ্ছে আনুমানিক ৩.৪ বিলিয়ন বা ৩ শ ৪০ কোটি। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় প্রতি সাত জনের মধ্যে একজন সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনিয় খাবার পায় না। বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বসবাস করে এবং সেখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ১২.৯ শতাংশ অপুষ্টির শিকার হয়। বিশ্বে ক্ষুধার্ত জনগোষ্ঠীর মোট দুই তৃতীয়াংশ-এশিয়াতে বসবাস করে। সাব সাহারান আফ্রিকায় ক্ষুধার প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি যেখানে মোট জনসংখ্যার প্রতি চারজনের মধ্যে একজন অপুষ্টির শিকার হয়। বিশ্বে প্রতি বছর ৩১ লাখ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুরা দারিদ্রতা, ক্ষুধা ও পুষ্টিহীনতার কারণে মৃত্যু বরণ করে। বিশ্বের মোট ৬ কোটি ৬০ লাখ প্রাথমিক স্কুলের শিশুরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় স্কুলে যায়।

বিশ্বে খাদ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি আরও সাড়ে চার কোটি মানুষকে ক্ষুধার্ত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা - WHO-এর "বিশ্ব ক্ষুধা ও দারিদ্র্য পরিসংখ্যান প্রতিবেদন-২০১১" অনুযায়ী - বিশ্বের শীর্ষ ১০টি স্বাস্থ্য ঝুঁকির তালিকায় "ক্ষুধা" এর অবস্থান এক নম্বরে। এটা এইডস, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা সহ জটিল রোগগুলোতে যত লোক মারা যায়, তার চাইতে অনেক বেশি লোক মারা যায় "ক্ষুধা" ও "পুষ্টিহীনতায়" । উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে যতগুলো মৃত্যু হয়, এর এক তৃতীয়াংশ "ক্ষুধা" ও

"পুষ্টিহীনতার" কারণে হয়। অপুষ্ট মায়েরা প্রায়ই কম ওজনের শিশুর জন্ম দেয় এবং বিশ্বে প্রতি বছর ১ কোটি ৭০ লাখ কম ওজনের শিশুর জন্ম হয়, যাদের ২০ শতাংশ শিশু পাঁচ বছর বয়সের আগে মারা যাওয়ার আশংকা থাকে।

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। মোট আয়তন ১৩০,১৭২ কিঃমিঃ (৫০,২৬০ বর্গ. মাইল) এবং মোট জনসংখ্যা ১৬০ মিলিয়ন বা ষোল কোটি। আনুমানিক ৪৭ মিলিয়ন বা ৪ কোটি সত্তর লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। শিশু অপুষ্টির হার ৪৮% এবং প্রতিবছর ৫৩ হাজার শিশু অপুষ্টিজনিত জটিলতায় ভুগে মারা যায়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সীমিত সম্পদ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে বাংলাদেশ আজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ১৯৯২-২০১০- এ ১৯ বছরে দারিদ্র্য কমেছে ২৫ দশমিক ১ শতাংশ। ১৯৯২ সালে থাকা ৫৭ শতাংশ দারিদ্র্যের হার ২০১৪ সালে এসে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে কমিয়ে ২৫ শতাংশে আনতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৯০ সালে দেশে মাথাপিছু আয় ছিল ২৬৫ ডলার এবং ২০১৪ সালে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩১৪ ডলার। বাংলাদেশে কৃষি পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লাখ ৮৯ হাজার যা মোট জনসংখ্যার ৫৩.৫৭ শতাংশ। এ পরিবারগুলো নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজ উদ্যোগে তাদের নিজেদের খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করার সাথে সাথে বাড়তি যোগান দেয় অকৃষি খাতে জীবন নির্বাহ করা ১ কোটি ৩০ লাখ ৭৭ হাজার পরিবারের যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৬.৪৩ শতাংশ। বর্তমান জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ আসে কৃষি খাত থেকে। ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশের খাদ্য (ধান ও গম) উৎপাদন হয়েছিল ১০.৪৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ২০১০- ২০১১ সালে খাদ্য (ধান ও গম) উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৩৫.০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং বাংলাদেশ খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন করে। বিগত ১০ বছরে দেশর মাতৃমৃত্যুহার ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। স্বাক্ষরতার হার ৩০ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষায় দেশ জেন্ডারসাম্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশে প্রথম বাজেট ছিল পাঁচশ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশের বাজেট ছিল ২৯৫,১০০ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেট হচ্ছে ৩,৪০,৬০৫ কোটি টাকা।

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়ানোর স্বপ্নকল্প নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে অনেক বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। সেই স্বপ্নকল্পের বাস্তবায়নে ওই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ৬০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে । এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ছয় বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে রূপপুরে তৈরি হতে যাওয়া একমাত্র পারমাণবিক কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে যাচ্ছে। ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমাণবিক বিদ্যুেকেন্দ্রের প্রথম ইউনিট ২০২২ সালে এবং একই ক্ষমতার দ্বিতীয় ইউনিটটি ২০২৩ সালে চালু হবে। আর সরকার প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিট বুঝে নেবে যথাক্রমে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে। এই প্রকল্পে ব্যয় হবে এক লাখ কোটি টাকার কিছু বেশি। যা বাংলাদেশে এযাবৎ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ব্যয়বহুল প্রকল্প। চালুর পর এর লাইফ টাইম বা আয়ুকাল ধরা হচ্ছে ৮০ বছর। ঢাকা ও চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এক্সপ্রেস ট্রেন সার্ভিস চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সারা দেশকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের অধীনে আনার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়ানোর স্বপ্নকল্প এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে পোশাক শিল্প, জাহাজ নির্মান শিল্প, ঔষধ শিল্প, চামড়া শিল্প, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স খাত, ICT খাত, কৃষি খাত বিশেষ করে "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্প, জলবায়ু সহনশীল অংশগ্রহণমূলক বনায়ন ও পুণঃবনায়ন প্রকল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর সহ বড় বড় প্রকল্পগুলোকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে।

উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়ানোর স্বপ্নকল্প সফল করার অগ্রযাত্রায় কায়িক শ্রমের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে ও সমান গুরুত্ত দিতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীর চিত্র বদলে গেছে। বর্তমানে বিশ্বের শ্রমবাজার দুই ধরনের। একটি হচ্ছে কায়িক শ্রমনির্ভর, অন্যটি মেধানির্ভর। একটি দেশকে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিতে হলে এই ধরনের শ্রমবাজারকেই সমানভাবে গুরুত্ত দিতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে চার কোটির মত ছাত্র-ছাত্রী আছে।তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ও এই দুই ধরনের শ্রমবাজারের গুরুত্বের প্রতিফলন থাকতে হবে।

কৃষিঃ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও কৃষি এখন গ্রামবাসীর কর্মসংস্থান ও আয়ের প্রধান উৎস। কৃষি এ দেশের প্রায় ১৫ কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান দিচ্ছে। বর্তমান জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ আসে কৃষি খাত থেকে। কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের কৃষিতে প্রচুর অগ্রগতি হয়েছে। উৎপাদন বেড়েছে। নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত জাতের ধান উদ্ভাবনে ব্যাপক ফসল ফলায় উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সময়মতো উন্নতমানের বীজ, সার, কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণে সহজলভ্য সরবরাহ হওয়ায় ফসলও দ্বিগুণ হয়েছে।

বাংলাদেশে কৃষি পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লাখ ৮৯ হাজার যা মোট জনসংখ্যার ৫৩.৫৭ শতাংশ। এ পরিবারগুলো নিজ উদ্যোগে তাদের নিজেদের খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করার সাথে সাথে বাড়তি যোগান দেয় অকৃষি খাতে জীবন নির্বাহ করা ১ কোটি ৩০ লাখ ৭৭ হাজার পরিবারের যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৬.৪৩ শতাংশ। অন্তত এই ১ কোটি ৫০ লাখ ৮৯ হাজার কৃষি পরিবার যদি সুষ্ঠুপরিকল্পনার মাধ্যমে একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্প কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে, তাহলে পুরো বাংলাদেশ একটি খাদ্য ভান্ডারে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা ধানের পাঁচ জাত উদ্ভাবন করেছে। বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা ধানের পাঁচ জাত উদ্ভাবন করেছে। গাজীপুরস্থিত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) জানায়, বাংলাদেশের লবণাক্ততা, আকস্মিক বন্যা, খরা ও ঠাণ্ডা পীড়িত এলাকায় ধান উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে গত পাঁচ বছরে ধানের পাঁচটি জাত উদ্ভাবন করেছে ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট-ব্রি কম্পোনেন্ট (আইএপিপি-ব্রি কম্পোনেন্ট)। উদ্ভাবন করা হয়েছে নয়টি ফসল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি। ফলে প্রকল্প এলাকায় ব্রিডার বীজ উৎপাদনের সক্ষমতা বেড়েছে। এ ছাড়াও খরা, বন্যা ও ঠাণ্ডা সহনশীল আরও উন্নত ধানের জাত উদ্ভাবন করার প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে, যেগুলোর অগ্রগামী কৌলিক সারিসমূহ ইতিমধ্যেই উদ্ভাবন করা হয়েছে।

আইএপিপি-ব্রি এর কৃষি বিজ্ঞানীরা জানান, বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের আকস্মিক বন্যা, খরা ও ঠাণ্ডা পীড়িত রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী এই চারটি জেলায় এবং জোয়ার ভাটা ও লবণাক্ততা কবলিত বরিশাল অঞ্চলের ঝালকাঠি, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী এই চারটি জেলার ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করার মূল উদ্দেশ্যে আইএপিপি-ব্রি কম্পোনেন্ট থেকে প্রকল্পের সহযোগিতায় গত পাঁচ বছরে ধানের পাঁচটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত জাতগুলো হলো– ব্রি ধান৬১, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৬৫, ব্রি ধান৬৬ এবং ব্রি ধান৬৭। আইএপিপি ব্রি-অঙ্গ প্রকল্প থেকে এ পর্যন্ত পাঁচটি ধানের জাত এবং নয়টি ফসল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন ছাড়াও ৪৫ টন ব্রিডার বীজ, ৩৫০টি প্রযুক্তি প্রদর্শনী এবং ১ হাজার ৪৬০টি পিভিএস, ভ্যালিডেশন, অ্যাডাপটিভ ট্রায়াল কৃষকের মাঠে স্থাপন করা হয়েছে।

এ প্রকল্প থেকে এ পর্যন্ত তিন হাজার জন কৃষক, ৮৬০ জন বৈজ্ঞানিক সহকারী ও বিজ্ঞানীদেরকে আধুনিক ধান উৎপাদন ব্যবস্থাপনার ওপরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ব্রির গবেষণা দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৯১টি ল্যাব ইকুয়েপমেন্ট, বিভিন্ন কেমিক্যালস ও ল্যাব এক্সেসরিজ ক্রয় করা হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় রংপুর ও বরিশালের ব্রিডার বীজ উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আশা করা যায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে ব্রির গবেষণা দক্ষতাসহ প্রকল্প এলাকার ধানের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। আয়োজকরা জানান, দি গ্লোবাল এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম (জিএএফএসপি) এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি পরিচালিত। তবে সরকার ঘোষিত ***"একটি বাড়ি, একটি খামার"*** প্রকল্প সহ কৃষি ভিত্তিক অন্যান্য প্রকল্পগুলো যেদিন বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে – প্রতিটি বাড়িতে সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়িত হবে, সেদিন মনে হয় পুরো বাংলাদেশ একটি খাদ্য ভাণ্ডারে পরিণত হবে।

যে কৃষক ধান ফলান, তিনি তার বাড়ির আঙ্গিনায় শাক সবজির আবাদ করতে পারেন, তার পুকুরে মাছ চাষ করতে পারেন, কয়েকটি হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল পালন করতে পারেন। দৈনন্দিন জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের মধ্যে এগুলো আবশ্যকীয়ভাবে প্রয়োজন পড়ে। এর মাধ্যমে একজন কৃষক তার চৌহদ্দি থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছু অনায়াসে পেতে পারেন এবং বাড়তি অংশ বাজারে বিক্রি করতে পারেন। এর পাশাপাশি বাড়ির চারি পাশে কিছু ফলজ, কিছু বনজ এবং কিছু ঔষুধি গাছ লাগাতে পারেন। এগুলোর মাধ্যমে একজন কৃষক অনায়াসে অনেক টাকা আয় করতে পারেন। এদেশে প্রতিটি পরিবার যদি সমৃদ্ধ হয়ে সুখে থাকে তাহলে নিশ্চিত সুখে থাকবে বাংলাদেশ।

সরকারের কৃষি বিভাগের পরামর্শ মতে, বাড়ির আঙ্গিনার একচিলতে জমি পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনায় হয়ে ওঠতে পারে পরিবারের সারা বছরের পুষ্টির নিত্য যোগানদার। কৃষক পারে বিষমুক্ত পছন্দের শাকসবজি খেয়ে সুস্থ জীবন যাপন করতে। বারমাসী মরিচ, সিংনাথ বেগুন, মাচায় চাউলে লাউ কুমড়া চালকুমড়ার লতানো বাহনি, গাঁদাফুলের বর্ণিলচ্ছটায় বসতবাড়ি আঙ্গিনাকে সাজারে অপরূপ সাজে। ছোট্ট জমিতে ভাগাভাগি করে ফলাতে পারে মৌসুমি শাকসবজি। একটি উদাহরণ দিয়ে নকশাটাকে বিশ্লেসন করা যায়। (১) ১নং প্লটে ফুলকপি, ২নং প্লটে টমেটো, ৩নং প্লটে বাঁধাকপি, ৪নং প্লটে বেগুন, ৫নং প্লটে ওলকপি, ৬নং প্লটে শালগম, যথাযথভাবে উৎপাদন কৌশল অবলম্বন করে ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যেতে পারে। আবার প্রতিটি প্লটের দু'পাশে- (২) ১নং প্লটে পেঁয়াজ, ২নং প্লটে রসুন, ৩নং প্লটে ধনিয়া, ৪নং প্লটে লেটুস, ৫নং প্লটে আদা, ৬নং প্লটে মৌরি - এভাবে

সাজিয়ে লাগাতে পারে। তাছাড়া বেড়া হিসেবে চারপাশে অড়হর লাগালে শুধু ফসল ফলনই আসবে না এদের ঝাঁঝালো গন্ধের কারণে অপকারি পোকামাকড় রোগ থেকে রক্ষা পাবে বাগানের ফসল। তাহলে শুধু কৌশল আর পরিকল্পনা কারণে রক্ষা পাবে পারিবারিক বাগানের ফসল। খরচ যাবে কমে লাভ হবে বেশি। এর সাথে সাথে বসতবাড়ির এই খামারে নিম, তুলসী, বাসক, আকন্দ, হরিতকি, বহেরা, আমলকী সহ নানা ঔষধি গাছগুলু ও এই পারিবারিক খামারে রাখা যেতে পারে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: প্রবন্ধ "একটি বাড়ি একটি খামার" লেখক: মো. জাহাঙ্গীর আলম, ফার্ম ব্রডকাস্টিং অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেইট, ঢাকা।

<u>মৎস্য খাত:</u>

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাত অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি খাত। বর্ধিত জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে মৎস্য খাত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় ১৪ লাখ নারীসহ দেশের ১১ শতাংশের বেশি মানুষের জীবন-জীবিকা মৎস্য খাতের ওপর নির্ভরশীল।

বর্তমানে মৎস্য খাত জাতীয় জিডিপিতে ৪.৯২ ভাগ অবদান রেখে চলছে, সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনে যার অবদান শতকরা ২৩ ভাগ। মৎস্য চাষে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ফলে বর্তমানে শুধু মিঠা পানিতে নয় বরং সমুদ্র উপকূলেও এর চাষ ও আহরণ কার্যাদী সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে দেশের মৎস্য উৎপাদন ২৩২৮৫৪৫ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে যার মধ্যে ১৮,৪৮,৭৩৫ মেট্রিক টন মিঠা পানির মাছ এবং ৪,৭৯,৮১০ মেট্রিক টন লোনা পানির সামুদ্রিক মাছ।

বাংলাদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠির আমিষের চাহিদা পূরণে মাছ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সরবরাহকৃত প্রানীজ আমিষের প্রায় শতকরা ৬৩ ভাগ হচেছ মৎস্যজাত আমিষ। বাংলদেশের উৎপাদিত প্রায় সকল প্রজাতির মাছই মানুষ খেয়ে থাকে এবং এর ফলে আমিষযুক্ত খাদ্য এবং অধিক পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহে মৎস্য উপ-খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ সেক্টরের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জনশক্তির কর্মসংস্থানের পরিধিও যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক হিসাব মতে বর্তমানে বাংলাদেশে ১২,৮০,০০০ জন লোক মৎস্য চাষ ও আহরণে নিয়োজিত রয়েছে, যাদের মধ্যে ৭,৭০,০০০ জন দেশের অভ্যন্তরীণ মিঠা পানিতে এবং ৫,১০,০০০ জন লোনা পানিতে মৎস্য চাষে য়োজিত। এছাড়াও প্রায় ৩.০৮ মিলিয়ন মৎস্য এবং চিংড়ী চাষী তাদের জীবিকা অর্জনে সম্পূর্নভাবে মৎস্য চাষের উপর নির্ভরশীল। তদুপরি একটি বিরাট জনগোষ্টি মৎস্য বিপণন ও প্রক্রিয়াকরন সহ মৎস্য বিষয়ক শিল্পে কর্মরত রয়েছে। মৎস্য শিল্পের চাহিদারবৃদ্ধির সাথে সাথে বহু গবেষণা ষ্টেশন স্থাপনসহ প্রচুর হ্যাচারী ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গুলোতে মৎস্য বিজ্ঞানের উপর উন্নতর শিক্ষাদান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ফলে প্রতি বৎসর মৎস্য বিজ্ঞানে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষে বিশ্বে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য প্রতিটি জলাশয়কে মাছ চাষের আওতায় আনা একান্তভাবে প্রয়োজন। সরকার মৎস্য খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। লাগসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া

ও কুচিয়াসহ সকল প্রকার মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবহার, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব ও উন্নত প্রযুক্তি মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণের ফলে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৩৬ লাখ ৮৪ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

বর্তমানে মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি বৈদেশিক মূদ্রা আয় করার একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। বিশেষত: চিংড়ী, কাকড়া ও অন্যান্য মৎস্য আইটেম রপ্তানি করে বৈদেশিক মূদ্রার একটি বড় অংশ আয় করেছে, যার পরিমাণ মোট বৈদেশিক মূদ্রা আয় এর প্রায় ৫.৭১ ভাগ। এক হিসাব মতে শুধুমাত্র চিংড়ী রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মূদ্রা আয় হয় তার পরিমাণ তৈরী পোশাক রপ্তানির পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

সরকারী উদ্যোগ ইলিশ মাছ প্রজননের পদক্ষেপ নেয়ার ফলে ইলিশ মাছের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচেছ। রপ্তানি মূখী আয়ের সম্ভাবনার ফলে চিংড়ী চাষের নতুন নতুন খামার সৃষ্টি সহ চিংড়ী উৎপাদনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। দেশের প্রায় ১,৬৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার সামুদ্রিক জলসীমায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার বঙ্গোপসাগরে গভীর সমুদ্রের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বিশাল সমুদ্র এলাকার গবেষণা ও জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য 'আর ভি মীন সন্ধানী' নামে একটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় করেছে। এই জাহাজের মাধ্যমে সমুদ্র এলাকায় মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য সম্পদের মজুদ নির্ণয় ও সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

সরকার এই বিশাল সমুদ্র এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ সকল পদক্ষেপ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা মৎস্য আহরণ , বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এবং এর পাশাপাশি বাংলাদেশের মৎস্য খাতের সার্বিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সবাই যদি আরো নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে এবং বিশেষ করে সরকার ঘোষিত ***"জল আছে যেখানে, মৎস্য চাষ সেখানে"*** কার্যক্রম যদি সত্যিকারার্থে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়, তাহলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পোশাক খাতের ন্যায় অনেক বড় অবদান রাখতে পারে।

জাহাজ নির্মাণ শিল্প: ২০১১ সলে বাংলাদেশের সকল সংবাদমাধ্যমগুলুর সংবাদ শিরোনাম ছিল 'জার্মানি যাচ্ছে দেশে তৈরি দু'টি বিশাল জাহাজ। সেসময় বাংলাদেশে নির্মিত এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ জাহাজ 'গ্রোনা এমারসাম' ও 'গ্রোনা বিএসাম' বাংলাদেশের নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড জার্মান মালিকের প্রতিষ্ঠান গ্রোনা শিপিং-এর কাছে হস্তান্তর করে। ১০০ মিটার দীর্ঘ জাহাজ দু'টির প্রত্যেকটি ৫,২০০ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন। এগুলোর প্রত্যেকটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৮০ কোটি টাকা করে। ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড, গ্রোনা শিপিং-এর কাছে ২০১২ সালের মধ্যে মোট ১২টি জাহাজ হস্তান্তরর করে। সম্পূর্ণ প্রকল্পটির জন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ৯০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশের সকল সংবাদমাধ্যমগুলুর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলু ও এই সংবাদটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করে। BBC- এর সংবাদ শিরোনাম ছিল- "Bangladesh shipbuilding goes for export growth". BBC News. Asia Times Online- এর সংবাদ শিরোনাম ছিল- "Bangladesh turns from hulk-breaking to shipbuilding". সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের প্রবেশ ২০০৭ সালে

হলেও ২ বছরের মধ্যে বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপ ইয়ার্ড এবং আনন্দ শিপ বিল্ডার্স এ পর্যনন্ত ছোটবড় ১২টি সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ করে বিদেশে রফতানি করেছে।
বিশ্বে ছোট এবং মাঝারি আকারের জাহাজ নির্মাণর মার্কেট হচ্ছে বাৎসরিক প্রায় ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ খুব বড় জাহাজ তৈরীর সক্ষম নয়। দেশের নৌ পথে আভ্যন্তরীণ পণ্য পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় যত বড় সব ধরনের জাহাজ এই শিপইয়ার্ডগুলুই নির্মান করে থাকে। বাংলাদেশে ১৬৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার নৌপথ রয়েছে। বাংলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ, বরিশাল এবং খুলনায় প্রায় ২০০ শিপ বিল্ডিং ইয়ার্ড গুলু রয়েছে।

বাংলাদেশর জাহাজ শিল্প যদি সরকারের প্রয়োজনীয় সমর্থন ও পৃষ্টপোষকতা পায়, তাহলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের জাহাজ নির্মাণ মার্কেটের 2% কাজ বাংলাদেশ করতে পারবে। জাহাজ নির্মাণ শিল্প একটি শ্রমঘন শিল্প হওয়ার কারণে, বাংলাদেশে নির্মিত জাহাজ ১৫ শতাংশ সস্তাএবং গুণগতভাবে আন্তর্জাতিক মানের।

বর্তমানে বাংলাদেশ শিপইয়ার্ডগুলু ১৬% হারে ঋণ নিতে পারে। তাদের এই ঋণের হার যদি ১০% নামানো যায়, তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের মত বড় ধরনের অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব। ২০১১ সালে অর্থ মন্ত্রণালয় এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য ২০০০ মিলিয়ন টাকার একটি রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (Export Development Fund -EDF) এর পরিকল্পনা করে।

তাছাড়া, বাংলাদেশের শিপবিল্ডিং শিল্পের উন্নয়নের জন্য আরেকটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হচ্ছে জাহাজ নির্মাতাদের মডেলগুলু পরীক্ষা - নিরীক্ষা বা Hydrodynamic Test- এর জন্য বুয়েট (Bangladesh University of Engineering and Technology-BUET) বা অন্য কথাও একটি তুইং ট্যাঁক (TOWING TANK) বা শিপ মডেল বেসিন তৈরী করা। এতে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। শিল্প মালিক, সরকার এবং দাতাদের সহযোগিতায় যদি এটা করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের জাহাজ শিল্প উন্নয়নে এটা অনেক বড় ভূমিকা পালন করবে।

সরকার ইতোমধ্যে শিপ বিল্ডিং জোন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। যদি ও এ জন্য স্থান নির্ধারণের কোন পদক্ষেপ এখনও নেওয়া হয়নি। শিপ বিল্ডিং জোন প্রতিষ্ঠার জন্য চট্টগ্রাম, ঢাকার মেঘনাঘাট এলাকা এবং খুলনার মংলায় যথেষ্ট অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে। একটি শিপ বিল্ডিং ইয়ার্ডের জন্য প্রয়োজন নদীমুখ সংলগ্ন সর্বোচ্চ ২শ' মিটার জমি। নদীমুখের পেছনে থাকতে হবে অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় জমিসমূহ। চট্টগ্রামে কর্ণফুলীর দক্ষিণ পাড়ের ৪০ হাজার মিটারের এলাকায় নদীমুখের সর্বোচ্চ ৪ হাজার মিটার জমি নিয়ে একটি শিপ বিল্ডিং জোন প্রতিষ্ঠা করার সুবিধা রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের ১২নং জেটি থেকে কালুরঘাট ব্রিজ পর্যন্ত ৪০ কি.মি. এলাকাজুড়ে কর্ণফুলীর দক্ষিণ পাড়ে এখনও এ ধরনের তেমন কোন শিল্প প্রতিষ্টান গড়ে ওঠেনি। নদীমুখ এবং সাগরের সঙ্গে সংযুক্তি থাকার কারণে কর্ণফুলী নদীর এই ৪০ কি.মি. এলাকাজুড়ে অসংখ্য শিপ বিল্ডিং ইয়ার্ড গড়ে তোলার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

আইসিটি: বিশ্বে বছরে এক ট্রিলিয়ন বা এক লাখ কোটি মার্কিন ডলারের বাজার রয়েছে আউটসোর্সিংয়ে। পৃথিবীতে এমন অসংখ্য লোক আছে, যারা কেবলমাত্র কম্পিউটার প্রযুক্তিকে পুঁজি করে কোটি কোটি টাকা

উপার্জন করেছেন। Mr Bill Gates এই বর্তমান বিশ্বের এক নম্বর ধনী হয়েছেন এই কম্পিউটার প্রযুক্তি দিয়েই। তিনি বিগত ২২ বছরে ১৮ বার বিশ্ব সেরা ধনী উপাদিতে ভূষিত হয়েছেন। তার সম্পত্তির পরিমান ৬ লক্ষ্য সতের হাজার কোটি টাকা। বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের এক বছরের বাজেট ছিল ২ লক্ষ্য ৯৫ হাজার কোটি টাকা। সেই হিসেবে মিঃ বিল গেটস এর সম্পত্তির পরিমান বাংলাদেশের মত একটি দেশের দুই বছরের বাজেটের চেয়ে ও বেশি। ফেসবুকের মালিক মিঃ Mark Zuckerberg মাত্র ৩১ বছর বয়সে আজ $48.6 বিলিয়ন ডলারের মালিক। তার ও পুঁজি ছিল একটি কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রযুক্তি ও নিরলস পরিশ্রম।

কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ১০ কোটি লোক এখনো ইন্টারনেট সুবিধার বাইরে রয়েছে, যা বিগত ১৬ মে, ২০১৬ তারিখে বিশ্বব্যাংক কতৃক প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১৬: ডিজিটাল ডিভিডেন্ট' শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৩ কোটি মোবাইল ব্যবহারকারী রয়েছে এবং দ্রুত ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ ঘটছে। বর্তমান বিশ্বের সর্ব শ্রেষ্ঠ "জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্য ভান্ডার" হচ্ছে "ইন্টারনেট"। আর বাংলাদেশের ১০ কোটি মানুষ ইন্টারনেট সুবিধার বাইরে থাকার অর্থই হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের সর্ব শ্রেষ্ঠ "জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্য ভান্ডার" থেকে দুরে থাকা।

১৩ মে, ২০১৬ তারিখে ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ বাংলাদেশে 'ইন্টারনেট ডট অর্গ' চালু করা নিয়ে তার ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন 'আমরা সম্প্রতি বাংলাদেশে রবি নেটওয়ার্কের সহায়তায় 'ইন্টারনেট ডট অর্গ' চালু করেছি। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে সংযুক্ত রাখতে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলাম' -বাংলাদেশে বিনাখরচে ২৫ টি ওয়েবসাইটে ঢোকা প্রসঙ্গে ফেসবুক পোস্টে তিনি একথা লিখেছেন। তিনি আরও লিখেছেন 'বাংলাদেশে প্রায় ১৭ কোটি মানুষের বাস। এর মধ্যে ১০ শতাংশেরও কম মানুষ ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত।' ইন্টারনেট ব্যবহার ও দারিদ্র সম্পর্কে একটি গবেষণার বরাত দিয়ে তিনি আরো লিখেছেন, 'ইন্টারনেটে যুক্ত প্রতি ১০ জনের মধ্যে একজন দারিদ্র্যকে জয় করতে পারেন। এর কারণে ইন্টারনেটের মাধ্যমে চাকরি, শিক্ষা, তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ করা সম্ভব হয়।

ফেসবুক পোস্টটির সাথে তিনি বাংলাদেশের একজন নারী সাংবাদিকের ছবিও পোস্ট করেছেন। ছবিটিকে উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন, এটি জয়িতার ছবি। তিনি বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক। মোবাইল ফোন ব্যবহার করে চাকরি ও খবরের আপডেট নেন তিনি।

ইন্টারনেট সুবিধার আওতার বাহিরে থাকা বিশাল জনগোষ্টিকে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক এবং ঢাকায় "জনতা টাওয়ারে" একটি সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণেরকাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক এ প্রায় ৭০০০০ লোকের কর্ম সংস্থান হবে, কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক হবে একটি বিশেষ আইসিটি জোন এবং আইসিটি ষেত্রে ইটা হবে দেশের প্রাণকেন্দ্র। যশোরে দেশের প্রথম সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের জন্য খুলে দিতে যাচ্ছে স্বপ্নের দুয়ার। যশোর শহরের নাজির শংকরপুরে প্রায় সাড়ে ৯ একর জায়গার ওপর ২৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ স্বপ্নের এই সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ১৫ তলাবিশিষ্ট এমটিবি ভবন ছাড়াও থাকছে ১২ তলাবিশিষ্ট ডরমেটরি ভবন, অত্যাধুনিক

কনভেনশন সেন্টারের সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং। সব ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে ভূমিকম্প-প্রতিরোধক কম্পোজিট কাঠামোতে (স্টিল ও কংক্রিট)। এখানে থাকছে ফাইবার অপটিক কানেকটিভিটি আর ৩৩ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন। আর নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য থাকছে দুই হাজার কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটর।

এ ছাড়া ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারের ব্যাকআপ রাখার জন্য এ পার্কে স্থাপন করা হয়েছে ডিজাস্টার রিকভারি ডাটা সেন্টার। বর্তমানে রাষ্ট্রের সব ডিজিটাল ডাটা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে রাখা হয়। কোনো দুর্যোগে যদি এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে দেশকে বড় ধরনের সংকটে পড়তে হবে। সে কারণেই এই ডাটা সেন্টারের একটি ব্যাকআপ যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে রাখা হচ্ছে। কারণ যশোর তুলনামূলকভাবে দেশের সবচেয়ে কম ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। এ ছাড়া দেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা একটি ডাটা সেন্টারও করা হবে এখানে। ব্যাংকগুলোর সহযোগিতায় সরকার এটি করে দিচ্ছে। কম্পিউটার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ফ্রিল্যান্সিং, কল সেন্টার, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট– এই চারটি ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের আইটি শিল্পোদ্যোক্তারা এখানে বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন। সরকার ইতিমধ্যে পাঁচটি বেসরকারি সংস্থাকে সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছে দেওয়া হয়েছে নির্দেশ. সংস্থাগুলো হচ্ছে - Accenture, Augmedix, Digicon Technologies, Bangladesh-Japan IT, and Kazi IT।

বাংলাদেশ সরকার ২০১৮ সালে আইটি খাত থেকে ১ বিলিয়ন ডলার উপার্জন করার টার্গেট নির্ধারণ করেছে এবং তা ২০২১ সালে ৫ বিলিয়ন ডলারে পৌছানোর ঘোষণা দিয়েছে। এটা যদি সম্ভব হয়, তাহলে আইটি খাত বাংলাদেশের জিডিপি তে ৫% অবদান রাখবে। প্রতি বছর বাংলাদেশ প্রায় ১২ লাখ কাজের সৃষ্টি হয়, যার অধিকাংশই পুরুষরা করে। বর্তমানে বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে ৩৩.৭% নারী নিয়োজিত। এবং এটাকে যদি ৮২% নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশের জিডিপি অনেকগুণ বেড়ে যাবে। এক্ষত্রে আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে।

চামড়া শিল্প: চামড়া শিল্প বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি খাত। বাংলাদেশে সাবেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনা বলেছিলেন, চামড়া খাত হচ্ছে চার পায়ের এমন একটি পা যার উপর এশিয়ার পরবর্তী টাইগার “বাংলাদেশ” দাঁড়িয়ে থাকবে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত চামড়া খাত থেকে $১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫৫ টি ট্যানারী শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। এগুলো পরিবেশ বান্ধব পণ্য উৎপাদিনের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে সাভারে শিল্প এলাকায় স্থানান্তরিত হবার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিশ্বে পরিবেশ বান্ধব পণ্যের চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্দি পাচ্ছে। শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলোর সাভারে পুরোদমে উৎপাদন শুরু করতে পারলে চামড়া জাত পণ্যের রপ্তানি অনেকগুণ বেড়ে যাবে।

ওষুধ শিল্প: ওষুধশিল্প সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের স্বপ্নের স্বর্ণদুয়ার খুলে দিয়েছে। ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাতের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তারা রীতিমতো বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছেন। রপ্তানি আয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে এ শিল্প।২০০৭-২০০৮ সালে বাংলাদেশের ওষুধশিল্প পণ্যের রপ্তানির পরিমান ছিল ৪ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার এবং ২০১৩-২০১৪ সালে ওষুধশিল্প পণ্যের রপ্তানির পরিমান বেড়ে দাড়িয়েছে ৬ কোটি ৯২ লক্ষ ডলার। এ খাতের

প্রবৃদ্ধি বিস্ময়কর। একসময়ের আমদানিকারক দেশ, এখন ওষুধের রপ্তানিকারক দেশের গৌরবে গৌরবান্বিত। এ দেশের উৎপাদিত ওষুধ অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণসহ বিশ্বের ১০৯টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। পৃথিবীর এলডিসি (লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি) বা অনুন্নত ৪৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ওষুধশিল্পে সবচেয়ে এগিয়ে আছে। বাংলাদেশের ওষুধের কাঁচামালের ৩০ শতাংশ তৈরি হচ্ছে স্থানীয়ভাবে, বাকি প্রায় ৭০ শতাংশ আসছে বিদেশ থেকে। দেশেই ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদন করতে পারলে প্রায় ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৫৪ হাজার কোটি টাকার) ওষুধ রপ্তানি করা সম্ভব।

বন ও পরিবেশ: বন ও পরিবেশ রক্ষা হলে পৃথিবী বাঁচবে, দেশ ও মানুষ বাচঁবে, তাই সবাইকে বন ও পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে **“Nature does not need people but People need nature”**– প্রকৃতি জন্য মানুষের প্রয়োজন নেই, মানুষের জন্য প্রকৃতি প্রয়োজন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য মতে, নানা দুর্যোগে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ছয় বছরে বাংলাদেশে ১৮ হাজার ৪২৫ কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩ সেমি বৃদ্ধি পেলে উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। সরকার পরিবেশ বিপর্যয়ের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় ইতিমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে সরকার।

পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী, শস্য খাতে ৩৬ দশমিক ২০ শতাংশ, প্রাণিসম্পদে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ, পোলট্রিতে ১ দশমিক ২১ শতাংশ, মৎস্য খাতে ৫ দশমিক ৮২ শতাংশ, জমিতে ২৬ দশমিক ৭২ শতাংশ, বসতঘর, রান্নাঘর ও গোয়ালঘর ১৭ দশমিক ১৯ শতাংশ এবং উঠানের গাছপালায় ৮ দশমিক ১০ শতাংশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনজীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কর্মসূচি প্রতিবেদনে এসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া দেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় খানা সংখ্যা ৪৩ লাখ ৬১ হাজার ২৬১টি এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার খানার প্রধান ঘর ৭০.৩১ ভাগ কাঁচা, ১৭.৪৪ ভাগ অর্ধপাকা এবং ১.৯৫ ভাগ ঝুপড়ি।

দুর্যোগের ধরন অনুযায়ী খানায় প্রভাব দেখা যায়— খরায় রাজশাহী বিভাগ প্রথম (২৫.৩৯%) এবং রংপুর বিভাগ দ্বিতীয় স্থানে (২৩.৯৯%), বন্যায় সিলেট বিভাগ প্রথম (৬৯.৯৭%) এবং ঢাকা বিভাগ দ্বিতীয় (৫১.৮৯%), জলমগ্নতায় খুলনা বিভাগ প্রথম (৩৪.৮৮%) এবং চট্টগ্রাম বিভাগ দ্বিতীয় (৩৪.৩৯%), ঘূর্ণিঝড়ে বরিশাল বিভাগ প্রথম (৭৮.৩১%) এবং চট্টগ্রাম বিভাগ দ্বিতীয় (৩০.৯৬%), টর্নেডোতে রংপুর বিভাগ প্রথম (১২.৩০%) এবং রাজশাহী বিভাগ দ্বিতীয় (৭.৫১%), জলোচ্ছ্বাসে বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগ যথাক্রমে ৩১.৫১% ও ১৩.৫১%, বজ্রপাত ও বজ্রঝড়ে (কালবৈশাখী ও আশ্বিনী ঝড়সহ) সিলেট ও রংপুর বিভাগ যথাক্রমে ৩১.৮৪% ও ২৩.৫৩%, নদী/উপকূলীয় চট্টগ্রাম ও রংপুর বিভাগ যথাক্রমে ৭.০১% ও ৬.৮৭%, ভূমিধসে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ

যথাক্রমে ০.৮০% ও ০.০২%, লবণাক্ততায় খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগ যথাক্রমে ২২.২৪% ও ৫.৩০%, শিলাবৃষ্টিতে ঢাকা ও রংপুর বিভাগ যথাক্রমে ২০.৮৬% ও ১৬.৬২%, অন্যান্য দুর্যোগ— যেমন কুয়াশা, শৈত্যপ্রবাহ, পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রভৃতিতে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ যথাক্রমে ১৪.৭৩% ও ১২.৮৬%। ২০০৯-২০১৪ সময়কালে অর্থাৎ ছয় বছরে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার খানার ৫৬% খানা একবার, ২৭% খানা দুবার, ১৭% খানা তিন বা ততধিকবার দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

জমির ক্ষয়ক্ষতি: প্রাকৃতিক দুর্যোগে ২০০৯-২০১৪ পর্যন্ত ছয় বছরের পরিবারভিত্তিক ১ লাখ ৫৫ হাজার ১৭৫ একর জমির মধ্যে শস্যক্ষেত্রের জমি ৮০.২২%, বসতভিটার জমি ১১.৯৭%, পুকুর ও জলাভূমির জমি ৩.৯৭%, বাগানের জমি ৩.০৬%, অন্যান্য জমি ০.৭৮% ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দুর্যোগের পূর্বাভাস: প্রাকৃতিক দুর্যোগে ২০০৯-২০১৪ পর্যন্ত ছয় বছরে পরিবারভিত্তিক পূর্বাভাস (আগাম সতর্কবার্তা) গ্রহণ করে যথাক্রমে ঘূর্ণিঝড়ে ৬৬.৭৩%, জলোচ্ছ্বাসে ৬১.০৩%, বন্যায় ১৭.৮৪%। অন্যদিকে যেসব পরিবার পূর্বাভাস গ্রহণ করে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েছে— যথাক্রমে ঘূর্ণিঝড়ে ৮৮.৪৮%, জলোচ্ছ্বাসে ৭৫.৮৫%, বন্যায় ১৮.৮৬%। দুর্যোগে পূর্বাভাস ৩৮% পরিবার টেলিভিশন, ২৫% বেতার, ২০% মোবাইল ফোন, আইভিআর প্রভৃতি থেকে, ১৪% পরিবার কমিউনিটি থেকে, ৩% পরিবার স্থানীয় প্রশাসন থেকে পেয়েছে।

দুর্যোগে আক্রান্ত পরিবারকে আর্থিক সহায়তা : প্রাকৃতিক দুর্যোগে ২০০৯-২০১৪ পর্যন্ত ছয় বছরে দুর্যোগ আক্রান্ত ৭৪% পরিবার সরকার, ১৫% পরিবার এনজিও বা আন্তর্জাতিক সংস্থা, ৪% পরিবার স্থানীয় ধনী ব্যক্তি, ৩% পরিবার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং ২% অন্যান্য উৎস থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে।

দুর্যোগে অসুস্থতা ও আহত : প্রাকৃতিক দুর্যোগে ২০০৯-২০১৪ পর্যন্ত ছয় বছরে ১৮ লাখ ৯০ হাজার ৭৩৪ জন পরিবার সদস্য অসুস্থ ও আহত হয়েছিল। এর মধ্যে ৫২.৪০% পুরুষ ও ৪৭.৬০% মহিলা অসুস্থ এবং ৫৮.১২% পুরুষ, ৪১.৮৮% মহিলা আহত হয়েছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় ৪৩ লাখ ৬১ হাজার ২৬১টি পরিবার রয়েছে। আর দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনসংখ্যা ২ কোটি ২০ লাখ ৪ হাজার ৩৬৭ জন। দেশের সর্বমোট প্রায় ১৩% পরিবার এবং ১২.৬৪% জনসংখ্যা দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বসবাস করে। দুর্যোগপ্রবণ এলাকার পরিবারের আকার ৪.৬৩। দুর্যোগপ্রবণ এলাকার পরিবারের প্রধান ঘর ৭০.৩১%, কাঁচাঘর ১৭.৪৪% অর্ধপাকা, ১০.১৯% পাকা, ঝুপড়ি ১.৯৫% এবং অন্যান্য ০.১১%। দুর্যোগপ্রবণ এলাকার পরিবারের পানির উৎস ৯৫.২৩% সাপ্লাই/পাইপ, শ্যালো, ডিপ টিউবওয়েল, নলকূপ এবং ৪.৭৭% পানির উৎস পুকুর, কূপ ও অন্যান্য। দুর্যোগপ্রবণ এলাকার পরিবারের মোট পাকা পায়খানা (ওয়াটার সিল ও সিলবিহীন) ৪৯.৯০%, কাঁচা পায়খানা ৪৬.৫৬% এবং খোলা জায়গা ৩.৫৪%।

এক্ষেত্রে জলবায়ু সহনশীল অংশগ্রহণমূলক বনায়ন ও পূণঃবনায়ন কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যথা (১) বাংলাদেশে এরকম অনেক লোক আছে যাদের অনেক পাহাড়ি জমি অনাবাদী ভাবে

অথবা অলাভজনক অবস্থায় পরে আছে। কিন্তু সেই জমির মালিকদের ওই অনাবাদী জমিগুলুতে লাভজনক কোনো প্রকল্প চালু করার মত আর্থিক সামর্থ্য বা সুযোগ নেই। (২) অন্যদিকে এদেশে বিশ্বব্যাংক সহ অনেক NGO বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে যারা "অংশগ্রহণমূলক বনায়ন ও পুণঃবনায়ন প্রকল্প" গুলু তে অর্থায়ন করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। (৩) এদেশে অসংখ্য ভূমিহীন, দরিদ্র, বিধবা ও দুর্দশাগ্রস্থ মানুষ আছে, যারা এ ধরনের প্রকল্পগুলুতে নিয়োজিত থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে।

অনাবাদি পাহাড়ি জমির মালিক, অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বা NGO এবং বনায়ন প্রকল্পগূলুতে পরিচর্যা করার জন্য শ্রমদানকারী দরিদ্র জনগোষ্টি- এই তিন পক্ষ যদি সমপরিমাণ লভ্যাংশ (প্রতিটি পক্ষ ৩৩% হারে) ভাগাভাগি করার ভিত্তিতে যদি চুক্তিবদ্দ হয়ে (Tripartite Agreement for Participatory Afforestation & Reforestation), বনায়ন প্রকল্পগুলো চালু করে এবং, "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্প এবং সামাজিক বনায়ন সহ এজাতীয় কার্যক্রম যদি সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে পুরো বাংলাদেশ একটি খাদ্য ভান্ডার ও সবুজ ভূমিতে পরিণত হবে।

<u>সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর:</u> একটি আন্তর্জাতিক মানের গভীর সমুদ্র বন্দর একটি দেশের অর্থনীতিকে কত উচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে পারে তা সিঙ্গাপুর ও জাপানকে দেখলে বোযা যায়।

বর্তমানে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মাধ্যমে প্রতিবছর আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ৬০ বিলিয়ন ডলার। যা প্রতিবছর গড়ে ৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতিবছর জাহাজ আগমন বৃদ্ধির হার ১১ শতাংশেরও বেশি। বর্তমানে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের পোতাশ্রয়ে মাদার ভেসেল ও বৃহৎ কনটেইনার নোঙর করতে পারে না। গভীরতা কম হওয়ায় মাত্র ১৮ শতাংশ জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে প্রবেশ করতে পারে। আধুনিকায়ন করা হলেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হবে না। বড় জাহাজগুলো গভীর সমুদ্রে নোঙর করার পর ছোট ছোট জাহাজ বা ট্রলারে মালামাল চট্টগ্রাম বন্দরে আনা-নেওয়া করা হয়। ফলে একদিকে সময় বেশি লাগে, অন্যদিকে ব্যয় কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। দেশ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্দর দুটিতে জাহাজজট ও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

২০০৮-৯ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের পুরো একবছরে পণ্য পরিচালনা করে ২৩ মিলিয়ন টন। প্রতিবছর তা ৯.২% হারে বৃদ্দি পাচ্ছে ।২০২০ সালে নৌবন্দর ভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য ৭০% থেকে ৮০% বৃদ্দি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।তাছাড়া, ২০২০ সালে সরকার মহেশখালীতে কৈলা ভিত্তিক বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মান করে জাতিয়া গ্রীডে 5320 MW বিদ্যুত যোগ করার সিদ্দান্ত নিয়েছে। এই বিদ্যুত কেন্দ্রে প্রতি বছর ২৩ মিলিয়ন টন (দৈনিক ৬০০০০ টন) কৈলার প্রয়োজন হবে এবং ওই কৈলাগুলু আমদানি করতে হবে Supramax বা Handymax ধরনের বড় বড় জাহাজ দিয়ে। সেই হিসেবে এই বিপুল পরিমানের পণ্য পরিচালনা করার সক্ষমতা চট্টগ্রাম বন্দরের নেই।

২০০৯ সালে জাপানি প্রতিষ্ঠান পেসিফিক কনসালট্যান্ট ইন্টারন্যাশনাল কক্সবাজারের মহেশখালীর সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দরের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়। বন্দর নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪২ হাজার কোটি টাকা এবং ২০৫৫ সালের মধ্যে তিন পর্যায়ে বন্দর নির্মাণের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হয়েছিল।

পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবজার এবং কক্সবজারের মহেশখালিতে অবস্থিত সোনাদিয়া দ্বীপ – এগুলো বাংলাদেশের জন্য প্রকৃতির বিশেষ দান। ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মিত হলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হবে এবং দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে আন্তর্জাতিক নৌপথগুলোর সংযোগ সাধন করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাবে। পরিবহন ব্যয় আনুমানিক ১৫ শতাংশ হ্রাস পাবে। বিপুল পরিমানের বৈদেশিক বিনিয়োগ হবে, সারা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন গতি আসবে। এ বন্দরকে কেন্দ্র করে নিকটবর্তী এলাকায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, অবকাঠামোগত ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি হবে। ফলশ কর্মসংস্থান বিপুলভাবে বাড়বে। আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে রাজস্ব আয়ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে। তেল-গ্যাস ও অন্যান্য সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের সুযোগ বাড়বে।

২০১৬ সালে জানুয়ারী মাসে বঙ্গোপসাগর ঘিরে উন্নয়নের একটি মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে বাংলাদেশে সরকারকে বিশদ তথ্য দিয়েছে জাপান। ২০১৬ থেকে ২০৪১ সাল পর্যন্ত এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রায় ৯ হাজার কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় হবে বলে সরকারকে জানিয়েছে উন্নয়ন সহযোগী জাপান। স্থানীয় মুদ্রায় এ বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৭ লাখ কোটি টাকার বেশি।

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) গত মাসে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে তাদের মহাপরিকল্পনা সম্পর্কিত একটি সার্ভে রিপোর্ট জমা দেয়। 'ডাটা কালেকশন সার্ভে অন ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফর সাউদার্ন চিটাগাং রিজন' শীর্ষক এ রিপোর্টটি বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। জানা গেছে, জাপানের এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ছাড়াও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, শিল্প ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও আলোচনা করেছে জাইকার একটি প্রতিনিধি দল। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, জাইকা জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার ও চীনকে নিয়ে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বেল্ট (বিগ বি ইনিশিয়েটিভ) গড়ে তোলার প্রয়াস রয়েছে তার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মাতারবাড়ীকে বেছে নেওয়া হয়েছে মহাপরিকল্পনায়। ওই এলাকায় এরই মধ্যে ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে জাপানের অর্থায়নে। ওই প্রকল্প থেকেই এ মহাপরিকল্পনার ভিত্তি রচিত হয় বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পাশাপাশি মাতারবাড়ীতে একটি মাল্টিপারপাস সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করতে চাইছে জাপান। যেখানে থাকবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চাহিদা অনুযায়ী বিপুল কয়লা নামানোর জন্য জেটি ও হারবার। এ বন্দরকে ভিত্তি করে গড়ে তোলা হবে একটি এনার্জি হাব, যার মধ্যে থাকবে কয়লা টার্মিনাল, তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) টার্মিনাল ও জ্বালানি পরিশোধন কেন্দ্র। বন্দর ও এনার্জি হাবকে ঘিরে গড়ে তোলা হবে বিশেষ শিল্পাঞ্চল, যেখানে স্টিল প্ল্যান্ট, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, সার ফ্যক্টরী স্থাপন হবে। এ ছাড়া দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে শিল্প-ফ্যাক্টরী স্থাপনের জন্য থাকবে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন। পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য গড়ে তোলা হবে পর্যটন কেন্দ্র। সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী এবং বিভিন্ন অবকাঠামোয় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য একটি পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলা হবে যেখানে আধুনিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাসহ প্রয়োজনীয় সব সুযোগ-সুবিধা থাকবে। যাতায়াতের জন্য হাইওয়ে এবং রেলওয়ে লিঙ্ক স্থাপন করা হবে যা কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম হয়ে সরাসরি

ঢাকার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। আর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে নিয়ে বঙ্গোপসাগরে যে বিগ বি ইনিশিয়েটিভ অর্থাৎ শিল্পোৎপাদন বেল্ট গড়ে তোলার আলোচনা চলছে তার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ওই মাল্টিপারপাস সমুদ্রবন্দর ভূমিকা রাখবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে জাপানের সার্ভে রিপোর্টে।

২০১৬ থেকে ২০৪১ সাল পর্যন্ত তিনটি ধাপে এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে যেখানে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে মাল্টিপারপাস বন্দর নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এনার্জি হাব গড়ে তুলতে ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে লাগবে আরও ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে বিনিয়োগের এ অর্থ একবারে লাগবে না বলে সরকারকে জানিয়েছে জাইকা। সংস্থাটি বলেছে, মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনটি ধাপের প্রথম পর্বে (২০১৬-২৬) বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে ২৭ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, দ্বিতীয় পর্বে (২০২৭-২০৩১) সময়ে বিনিয়োগ লাগবে ২২ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং শেষ পর্বে (২০৩২-২০৪১) বিনিয়োগ দরকার হবে প্রায় ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বঙ্গোপসাগরের মাতারবাড়ীকে ঘিরে গত বছর জাইকা একটি প্রাথমিক স্টাডি করেছিল যেখানে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়াও গভীর সমুদ্রবন্দর, শিল্প জোন ও পরিকল্পিত সিটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল। তবে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সময় ও ব্যয় সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানতে চাওয়া হয় ওই সময়। সম্প্রতি তারা আরেকটি সার্ভে রিপোর্ট দিয়েছে।

<u>বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স:</u> বৈদেশিক কর্ম সংস্থান ও রেমিটেন্স বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম মাইলফলক। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর বিশ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করে, যাদের মধ্যে প্রায় পাঁচ লাখ উচ্চ শিক্ষিত। বিগত ২৬ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছ, বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠীর ৬৬ শতাংশ অর্থাৎ ১০ কোটি ৫৬ লাখ মানুষ কর্মক্ষম, যাদের বয়স ১৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। বাংলাদেশের বিশাল এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে কর্মদক্ষ করে গড়ে তুলে তাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির তাগিদ দেওয়া হয়েছে। জনমিতির পরিবর্তন নিয়ে করা প্রতিবেদনে ইউএনডিপি বলেছে, এভাবে চলতে থাকলে ২০৩০ সালে বাংলাদেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা গিয়ে পৌঁছবে ১২ কোটি ৯৮ লাখে। এটি হবে তখনকার মোট জনগোষ্ঠীর ৭০ শতাংশ।

বাংলাদেশে এখন ৩০ শতাংশ মানুষ অন্যের ওপর নির্ভরশীল বলেও প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। যখন একটি দেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বেশি মানুষের বয়স ১৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে থাকে তখন জনমিতির পরিভাষায় বলা হয়, ওই দেশটি ডোমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনসংখ্যার বোনাসকালে যুক্ত হয়েছে। কারণ ওই বয়সের মানুষকে বলা হয় কর্মক্ষম। বিশ্বের যে কোনো দেশ এ সুযোগ একবারই পেয়ে থাকে। বাংলাদেশের জন্য এই সুযোগ তৈরি হয়েছে ২০১২ সাল থেকে, থাকবে আরও ২৫ থেকে ৩০ বছর। বিশাল এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে যদি দক্ষ জন সম্পদে রূপান্তর করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক জাদুকরী পরিবর্তন আসতে পারে।

সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের উন্নত বিশ্বের কাতারে যাবার জন্য প্রচুর সুযোগ-সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু কৃষি, শিক্ষা, তৈরি পোশাকই নয়; বাংলাদেশের রয়েছে বিপুল জনগোষ্ঠী। এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। বিদেশে বাংলাদেশের দক্ষ শ্রমিকদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

বিগত কয়েক বছর থেকে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে আসছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, বিভিন্ন দেশে শ্রমবাজারের চাহিদা বুঝে দক্ষ শ্রমিক তৈরী করে জনশক্তি রপ্তানি করতে পারলে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স আয় অনেক বেড়ে যাবে। কোন দেশে কোন কাজ, কী ধরনের লোক নিয়োগ করবে সে ধরন অনুযায়ী বিদেশে লোক পাঠানো দরকার। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। একজন দক্ষ শ্রমিকের কর্ম সক্ষমতা, বেতন-ভাতা একজন অদক্ষ শ্রমিকের চেয়ে অনেক বেশি। যে কোনো দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে সম্পদে পরিণত করার উত্তম হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি দিক ইতিবাচক হলেও বাস্তবমুখী অর্থাৎ কর্মমুখী নয়। অথচ দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে কর্মমুখী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া উচিত। বাংলাদেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যে, একজন স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিও যেন সেই শিক্ষার দ্বারা নিজেকে কোনো কর্মে নিয়োজিত রাখতে সক্ষম হয়। বিদেশের বাজারে চাহিদা ও ধরন অনুযায়ী শ্রমিক পাঠাতে সক্ষমতা অর্জন করতে পারলে বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের আয়ের পরিমাণও বেড়ে যাবে।

ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স শিল্প:

সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত হিসেবে ইলেকট্রনিক্স শিল্প বাংলাদেশে স্থান করে নিয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড-ছাড়াও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটি অভাবনীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানি হচ্ছে বাংলাদেশের তৈরি ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী। বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই শিল্পে রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতাও। বাংলাদেশে ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রীর প্রায় ৯০ ভাগ এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে। দেশে মোট চাহিদার ৩০ ভাগ বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম তৈরি হচ্ছে। বেশ কিছু পণ্য আফ্রিকা ও আরব দেশসমূহে রফতানি করা হচ্ছে। এছাড়া তাইওয়ান, চীনেও আমাদের এই পণ্যের বিপুল চাহিদা আছে। একটা সময় বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশ আমদানি করা হতো। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭ শতাধিক ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স কারখানা আছে।

২০০০ সাল থেকে দেশি প্রতিষ্ঠানগুলো ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেট্রনিক্স পণ্য উৎপাদন করছে এবং বিদেশেও রফতানি করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের প্রায় দুই হাজারের মতো শিল্প কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশে ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইজ ম্যানুক্যাফচারাইজ অ্যাসোসিয়েশেনের আওতাধীন রয়েছে ৭৫০টি শিল্প করাখানা। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের চাহিদা রয়েছে। তার মধ্যে ১৫ থেকে ১৬ হাজার কোটি টাকার পণ্য দেশেই তৈরি হচ্ছে। এসব শিল্প কারখানায় ৩ লাখেরও অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে, যার অধিকাংশই নারী।

বাংলাদেশে ইলেকট্রিক্যাল লাইট, ফ্যান, সুইচ, সকেট, প্লাগ, বোর্ড, ক্যাবল, ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সফরমার, টিভি, ফ্রিজসহ অসংখ্য পণ্য তৈরি হচ্ছে। আফ্রিকাসহ আরব দেশসমূহে এসব সামগ্রী রফতানিও হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও এই পণ্যগুলো নিয়ে নানা ধরনের কথা উঠছে। অনেকেই বলছেন, বাইরের যন্ত্রাংশ এদেশে এনে অ্যাসেম্বেল করে সস্তা দরে বাজারে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। অভিযোগটি একেবারেই ভিত্তিহীন নয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বাইরের নিম্মমানের যন্ত্রাংশ এনে অ্যাসেম্বেল করে সস্তা দরে বাজারে ছেড়ে দেয়ার ফলে খুব সহজেই সাশ্রয়ী মূল্যে ক্রেতা একেকটি ইলেকট্রনিক্স পণ্য হয়তো কিনতে পারছেন কিন্তু কয়েকদিন ব্যবহারের ফলে ঐ সামগ্রীটি আর ভালো থাকছে না। এতে পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি দুর্নাম বাড়ে আমাদের দেশেরও, যা দেশের ভাবমূর্তিকে অনেকটাই বিনষ্ট করে। চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, দ. কোরিয়া এই ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর হাত ধরে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগালে এতদিনে এই শিল্পটি একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্প হিসেবে দাঁড়াতে পারত।

একটা সময় বাংলাদেশে মেইড ইন জিঞ্জিরা দুর্নাম ছিল। সেই দুর্নামকে সুনামে রূপান্তর করা সম্ভব হয়নি। অথচ সেটিকে ব্রান্ড হিসেবে ব্যবহার করে উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করে বিদেশে রফতানি করা যেত। যে কোন উন্নততর প্রযুক্তি গ্রহণ করার ক্ষমতা বাংলাদেশের আছে। প্রযুক্তি কেউ কাউকে দিয়ে দেয় না। এটি নিজেদের মত করে তৈরি করে নিতে হয়। এখানে মূল প্রশ্ন হলো, প্রযুক্তিকে বাংলাদেশ টেকসই শিল্পের মতো করে প্রয়োগ করতে পারছে কিনা। তারপর রফতানির প্রশ্ন। তবে এ খাতে রয়েছে দক্ষ শ্রমিকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। দক্ষ শ্রমিক তৈরির ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে আরো এগিয়ে আসতে হবে। বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে বিশ্ব বাজারে তৈরি পোশাক শিল্পের মতো এই শিল্পটিও বড় জায়গা করে নিতে পারবে। শিল্প হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এটি কোন প্রভাব রাখবে না তা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতা এক্ষেত্রে খুবই জরুরি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: প্রবন্ধ "ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স শিল্প: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অপার সম্ভাবনার খাত" লেখক: রাবেয়া বেবী ও বারেক কায়সার, দৈনিক ইত্তেফাক

<u>পোশাক শিল্পঃ</u> বিশ্বে পোশাক পণ্যের বাজার মূল্য হচ্ছে ৬৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিগত ২০১৪ – ১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ থেকে পোশাক পণ্য রপ্তানি হয়েছিল প্রায় ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেই হিসেবে বিশ্বের পোশাক পণ্যের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক পণ্যের রপ্তানি হচ্ছে কেবলমাত্র ৪%। বর্তমানে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রায় চার হাজার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে প্রায় ৪৫ লক্ষ মানুষ কর্মরত । ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পোশাক রপ্তানির টার্গেট ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এই টার্গেট পূরণ করার জন্য প্রয়োজন সমগ্র জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গির আমুল পরিরতন। বর্তমানে পোশাক শিল্পের সাথে জরিত প্রতিটি মানুষ যদি মনেপ্রানে পণ্যর গুনগত মাণ বজায় রাখা ও সময়মত শিপমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করে এবং পুরো পোশাক শিল্পে যদি সম্পূর্ণ অনুকুল পরিবেশ বজায় থাকে এবং বিশেষকরে "মিড-ভ্যালু গার্মেন্টস ও ফ্যাশন বেসিকস পণ্য " উৎপাদনের পাশাপাশি, ব্যাপকভাবে "হাই-ভ্যালু গার্মেন্টস' বা দামি পোশাক উৎপাদন করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে, তাহলে আগামী আনুমানিক দশ / বার বছরে বাংলাদেশর পোশাক পণ্যের রপ্তানি ৫০ কিংবা ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা

রয়েছে। "হাই-ভ্যালু গার্মেন্টস' বা দামি পোশাক উৎপাদন করা সহজ নয়। এতে প্রচুর প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং বিশেষ করে উৎপাদনের সাথে জড়িত সমগ্র জনগোষ্টির ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

১৯৮০ সাল পর্যন্ত কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য মোট রপ্তানিতে ৫০% অবদান রেখে রপ্তানি আয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছিল। আশির দশকের শেষার্ধে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের আয়কে অতিক্রম করে পোশাক শিল্প রফতানি আয়ে প্রথম স্থানে চলে আসে। বর্তমানে এই শিল্পখাতে সরাসরি কর্মরত আছে 4.5 মিলিয়নেরও বেশি লোক, যার মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জন মহিলা। তৈরি পোশাক শিল্পের সাথে যক্ত হয়ে আছে বস্ত্র, সুতা, আনুষঙ্গিক উপকরণ, প্যাকেটজাতকরণের উপকরণ সহ অনেক শিল্প। এতদ্ব্যতীত পরিবহণ, ব্যাংকিং, শিপিং এবং ইন্সুরেন্স সেবার চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর সবটাই অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে। এ ধরনের নতুন পরোক্ষ-কর্মসংস্থান মূলত তৈরি পোশাক শিল্প কর্তৃক সৃষ্টি যার সুবিধাভোগী মোট ২,০০,০০০ শ্রমজীবী।

বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাকের (কেবলমাত্র ওভেন শার্ট) প্রথম চালানটি রপ্তানি হয় ১৯৭৮ সালে। এরপরেই বিদেশি ক্রেতাদের আগ্রহ বেড়ে যায় এবং এই শিল্প দ্রুত বেড়ে ওঠে। ১৯৮১-৮২ সালে মোট রপ্তানি আয়ে এই খাতের অবদান ছিল মাত্র ১.১%। ২০১০ সালের মার্চ মাসে তৈরি পোশাক শিল্পের অবদান দাঁড়িয়েছে মোট রপ্তানি আয়ের ৭৬%। ১৯৮৩-৮৪ সালে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয় মাত্র ০.৯ বিলিয়ন ডলার, যা ছিল বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৩.৮৯ ভাগ। ১৯৯৮-৯৯ সালে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় ছিল ৫.৫১ বিলিয়ন ডলার যা মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৭৫.৬৭ ভাগ। তবে নিট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ছিল এর মাত্র ৩০% কারণ, তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামাল এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ আমদানিতে ব্যয় হয় আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় ৭০%।

বিগত ২৫ বছরে তৈরি পোশাক শিল্প বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ১৯৭৮ সালে মাত্র ৯টি রপ্তানিমুখী পোশাক তৈরির ফ্যাক্টরীর উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করে আনুমানিক এক মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ আয় করেছিল বাংলাদেশ। অনেক ফ্যাক্টরী ছিল ছোট আকারের এবং এখানে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির পাশাপাশি স্থানীয় বাজারেও বিক্রি হতো। এরকম চারটি ছোট পুরাতন ফ্যাক্টরীর নাম রিয়াজ গার্মেন্টস, প্যারিস গার্মেন্টস, জুয়েল গার্মেন্টস এবং বৈশাখী গার্মেন্টস। এর মধ্যে রিয়াজ গার্মেন্টস ছিল পথ-প্রদর্শক, যা ঢাকায় রিয়াজ স্টোর নামে একটি ছোট দর্জির ফ্যাক্টরী হিসেবে ১৯৬০ সালে কাজ শুরু করে। এটি আনুমানিক ১৫ বছর স্থানীয় বাজারে কাপড় সরবরাহ করেছে। ১৯৭৩ সালে ফ্যাক্টরীটি নাম পরিবর্তন করে মেসার্স রিয়াজ গার্মেন্টস লিমিটেড নামে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে ১৯৭৮ সালে প্যারিসভিত্তিক একটি ফার্মের সাথে ১৩ মিলিয়ন ফ্রাংক মূল্যের ১০ হাজার পিস ছেলেদের শার্ট রপ্তানি করে। রিয়াজ গার্মেন্টসই প্রথম বাংলাদেশ থেকে সরাসরি পোশাক রপ্তানি করে।

১৯৭৯ সালে দেশ গার্মেন্টস লিমিটেড প্রথম যৌথ উদ্যোগে নন-ইকুইটি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে। দেশ গার্মেন্টস ও দক্ষিণ কোরিয়ার দায়েয়ু কর্পোরেশনের মধ্যে প্রযুক্তিগত এবং বাজারজাতকরণে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রথম দিকে মেশিনে কাজ করার মতো উপযোগী করে তোলার জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পরে পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৩ জন মহিলাসহ ১২০ জন মেশিন অপারেটর দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাই ১৯৮০ সালে উৎপাদন শুরু করে। এটা ছিল প্রথম

শতভাগ রপ্তানিমুখী কোম্পানি। ১৯৮০ সালে YONGONE নামে অপর একটি কোরিয়ান কর্পোরেশন বাংলাদেশি ট্রেকসীম লিমিটেড নামে অপর একটি কোম্পানির সঙ্গে প্রথম যৌথ উদ্যোগে তৈরি পোশাক ফ্যক্টরী গড়ে তোলে। বাংলাদেশি অংশীদাররা নতুন প্রতিষ্ঠান YONGONE বাংলাদেশ-এ শতকরা ৫১ ভাগ ইকুইটির মালিক হয়। এটি প্রথম ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ থেকে প্যাডেড এবং নন-প্যাডেড জ্যাকেট সুইডেনে রপ্তানি করে। উভয় ক্ষেত্রেই বাজারজাতকরণের দায় বিদেশি অংশীদাররাই নিয়েছিল। ১৯৮২ সালে ফ্যক্টরীর সংখ্যা ছিল ৪৭ এবং ১৯৮৫ সালে ৫৮৭, আর ১৯৯৯ সালে ২,৯০০টিতে উন্নীত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই শিল্পের সাফল্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই ধারাবাহিকতায় উৎপাদন ও রপ্তানি ক্ষমতা সমানতালে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৯ সালে ফ্যক্টরীর সংখ্যা ৩ হাজারে উপনীত হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: (১)প্রবন্ধ "২৫ থেকে ৫০ কত দূর?" লেখক: আবুল বাসার: গবেষক বিআইডিএস, সাবেক অর্থনীতিবিদ বিশ্বব্যাংক, সাবেক শিক্ষক উইলামেট বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা। (২) "৪৪ বছরে বাংলাদেশ : অসামান্য আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সারণি" লেখক : ড. ফরাসউদ্দিন, অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে -The grass is always green in the other side of the fence (বেড়ার ওপারে ঘাসগুলো সবসময় সবুজ-কোমল হয়)। আর সেই সবুজ-কোমল ঘাসের সন্ধানে অর্থাৎ নিজের এবং পরিবারের জন্য একটি নিরাপদ এবং সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করার আশায়, বাংলাদেশের কত ছেলে মেয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অবৈধভাবে সমুদ্র পথে থাইল্যান্ড – মালয়েশীয়া যাওয়ার পথে সাগরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে কিংবা গণকবরে চিরনিদ্রায় শুয়ে পড়েছে, তার কোন সঠিক তথ্য কোথাও নেই। হতে পারে, তারা থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় ভালভাবে পৌছে সেখানে সৌভাগ্যবশত ভাল কোন কাজ যদি যোগাড় ও করতে পারে, তারা সেখান থেকে তাদের পরিবারকে বিশ /ত্রিশ হাজার টাকা পাঠাতে পারবে। কিন্তু তারা যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে এবং ভাল কিছু দক্ষতা অর্জন করতে পারে, সেই পরিমান টাকা তারা বাংলাদেশে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে কাজ করে ও সহজে উপার্জন করতে পারে। এটা সত্য যে গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকরা এখনো অনেক ক্ষেত্রেই অনাদর, অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার। অথচ গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের হাতে লুক্কায়িত সকল দক্ষতা, সক্ষমতা ও সম্ভাবনাগুলোকে যদি আরও সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়, তাহলে তারা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে আরও অনেক দুর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

এটা দুর্ভাগ্যবজনক হলে ও সত্য যে বর্তমানে বাংলাদেশে আনুমানিক ৯৫% গার্মেন্টস ফ্যক্টরীগুলোতে ১০% থেকে ৩০% অপারেটরের ঘাটতি আছে। আর প্রতিটি ফ্যাক্টরীতে ক্রিটিকাল প্রসেস্সের অপেরাতর্দের তীব্র সংকট রয়েছে। অনেক সময় অনেক বেশি বেতন দিয়ে ও ভাল অপারেটর পাওইয়া যায় না। বলতে গেলে প্রতিথি ফ্যাক্টরিতে সুইং ফ্লোরের প্রোডাকশন স্টাফরা প্লাকেত জয়েন্ট, কলার জয়েন্ট, নেক জয়েন্ট, কলার টপ সিম, স্লীভ জয়েন্ট, পাইপিং এটাচ, শোল্দার জয়েন্ট, বডি হেম, সাইড স্লিত, প্লাচেকত বাক্স সহ গুরুত্তপূর্ণ প্রসেস্সের অপারেটর দের যোগান দিতে হিমশিম খেতে হয়। বাংলাদেশের প্রায় ৮০ % গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি শ্রমিকদের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করে। ফ্যাক্টরিগুলোর আসে পাশে অনেক ক্ষেত্রে অপারেটর পাওয়া যায়না বলেই এই পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হয়। এতে করে অনেক অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়।

আরো দূর্ভাগ্যজনক হচ্ছে যে বর্তমানে বাংলাদেশের ৯৫% গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি কেবলমাত্র বেসিক এবং সেমি ক্রিটিকাল ধরনের গার্মেন্টস উৎপাদন করে। এই বেসিক এবং সেমি ক্রিটিকাল ধরনের গার্মেন্টস গুলুর রেট এতই কম যে ঐ রেটে কাজ করে ফ্যাক্টরি চালানো খবই কঠিন। বেশি দামের ক্রিটিকাল স্টাইলগুলো বাংলাদেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলুতে করতে নাপারার প্রধান কারণ হচ্ছে ক্রিটিকাল প্রসেসের কাজ করার মত দক্ষ অপারেটরদের অভাব। সুতরাং, গার্মেন্টস শিল্পকে আরো এগিয়ে নিতে হলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোকে ক্রিটিকাল স্টাইল করার মত দক্ষতা এবং ইতিবাচক মানসিকতা থাকতে হবে। এবং সাথে সাথে প্রডাকশনে গুনগতমান সম্পন্ন আউটপুট ও বাড়াতে হবে। তবে এটা অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক হলে ও সত্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল মাত্র শ্রমিক ভাই-বোনদের আন্তরিকতার অভাবে গুনগত সম্পন্ন আউটপুট হয়না। উদাহরণস্বরূপ, একজন বেতনভুক্ত অপারেটর অনেক ক্ষেত্রে সাইড স্লিটে টেপ জয়েন্ট করে প্রতি ঘন্টায় কখনো ৪০, ৫০, ৬০, ৭০ পিছ এর মত এবং এগুলুতে ও অনেক ক্ষেত্রে কোয়ালিটি এত খারাপ হয়, যে সেগুলুর অধিকাংশ আবার “অল্টার” সারতে হয় এবং আউটপুট বেশি না হলে ও কিংবা কোয়ালিটি খারাপ হলে ও তারা কোনো সমস্যা মনে করেনা, কারণ সে বেতনভুক্ত অপারেটর এবং মাস শেষে সে বেতন পাবেই। অথচ একজন প্রসেস কন্ট্রাক্টের অপারেটর প্রতি ঘন্টায় ১০০ থেকে ১৩০ পিছ পর্যন্ত করে এবং তার কাজের বিল পাবার ক্ষেত্রে যেন কোনো ঝামেলা না হয়, এই জন্য তার কোয়ালিটি ও ভালো থাকে।

বিগত আঠারটা বছর আমার জীবনটা জড়িয়ে আছে গার্মেন্টস শিল্পের সাথে। বিশেষকরে প্রডাকশনের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে দায়িত্ত পালন করার কারণে কয়েক হাজার শ্রমিক ছেলেমেয়েদের সাথে বাবা সন্তানের মত সম্পর্ক গড়ে উথেছে। এ দীর্ঘ জীবনে তাদের সুখ-দুখ, হাসি-কান্না যেরকম দেখেছি, ঠিক সেরকম দেখেছি – তাদের মধ্যে লুক্কায়িত আছে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে বহুদুর নিয়ে যাওয়ার এক যাদুকরি শক্তি।

আমি একটি স্বপ্ন দেখি। আমি মনে মনে একটি ছবি আঁকি, যেখানে মনের ক্যানভাসের একপাশে গার্মেন্টস অপারেটররা মেশিন চালাচ্ছে এবং ক্যানভাসের অপর পাশে, তাদের সন্তানরা বিমান চালাচ্ছে, বিশাল বিশাল জাহাজ নির্মান করছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় ডাক্তার হিসেবে কাজ করছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইঞ্জিনিইয়ার অথবা স্থপতি হিসেবে কাজ করছে, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করছে, আইটিসি বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছে, বিশ্বখ্যাত টিভি চ্যানেলসমুহে সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত, তাদের সন্তানদের অনেকে প্রখ্যাত গায়ক, কিংবা অভিনেতা ও অভিনেত্রী হিসেবে আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করছে, আবার অনেকের সন্তানরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধার জোরে স্কলারশীপের মত বিভিন্ন সুযোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত।.....

বর্তমানে বাংলাদেশের অসংখ্য ছেলে-মেয়েরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্থাপত্য শিল্প, অটোমোটিভ প্রকৌশল, তেল-গ্যাস, ইউটিউব, অনলাইন পড়াশুনা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। যেমন বাংলাদেশি-আমেরিকান সেলিব্রেটি প্রকৌশলীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগান্তকারী সাফল্যের প্রাণপুরুষ সালমান খান, ইউটিউব-এর অন্যতম উদ্যোক্তা জাভেদ করিম, হাইব্রিড অটোমটিভের সবচেয়ে বেশি প্যাটেন্ট-এর মালিক ড. খাজা রহমান, তরুন গবেষক হিসেবে এ বছরেও

মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদক প্রাপ্ত ড. সাইফ সালাউদ্দিন, কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম পেন্টিয়াম টু এর প্রধান উদ্ভাবক মুস্তাফিজ চৌধুরী এবং বিশেষ বায়ো রোবট আবিষ্কারক এম তাহের সাইফ।

২০১০ সালে Fortune ম্যাগাজিনে একটি রিপোর্টে বিল গেটস বাংলাদেশী বংশদ্ভোত বরিশালের Dr. Fakhrul Amin Khan – এর ছেলে ৩৪ বছর বয়সের সালমান খানকে তার প্রিয় শিক্ষক বলে অবিহিত করেছেন। সালমান খানের ব্যাপারে Fortune ম্যাগাজিনের হেডলাইন ছিল "Innovation in Education: Bill Gates' favorite teacher"। বর্তমানে সালমান খানের সম্পত্তির পরিমান $200 মিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের ডব্লিউএইচএজি টিভি চ্যানেলের সংবাদ উপস্থাপিকা তাসমিন মাহফুজ, যুক্তরাষ্ট্রে নারী সাংবাদিকদের সম্মানজনক পুরস্কার গ্রাসিয়া অ্যাওয়ার্ড জিতে সাড়া ফেলেছেন। তাসমিন মাহফুজ জন্মেছেন ১৯৮৭ সালের ২৮ মে। জন্ম এবং বেড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পাম বিচে। তাসমিনের বাবার নাম আবদুল ওয়াহেদ মাহফুজ, মা নাজমুন মাহফুজ। তাদের বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলার বরকলে। 2015 সালের 25 মার্চ ঢাকাস্থ মার্কিন দুতাবাসের ওয়েবসাইটে সংবাদ শিরোনাম ছিল "Bangladeshi Students Design A Lunar Excavation Robot For NASA". বাংলাদেশের BRAC ইউনিভার্সিটির একদল ছাত্র আমেরিকার NASA's Kennedy Space Center এ একটি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার জন্য রিক্সা পার্টস সহ দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করে "চন্দ্রবোট"নামে মহাকাশে ব্যবহারের জন্য একটি রোবট আবিষ্কার করে। বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট' এর মতে, সুযোগ ও সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে বাংলাদেশের তরুণরা বিশ্বকে 'তাক লাগিয়ে দিতে পারে।

২০১৩ সালে ২৭ অগাস্ট, আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল "Bangladeshi scientist invents Solar Power run helicopter(বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর সৌর শক্তি চালিত হেলিকোপটার আবিষ্কার)"। সংবাদে বলা হয়, একজন বাংলাদেশী বংশদ্ভোত বিজ্ঞানী Dr Hasan Shahid-এর নেতৃত্বে লন্ডনে Queen Marry University-তে একদল ছাত্র 'Solarcopter' নামে বিশ্বের প্রথম সৌর শক্তি চালিত হেলিকপ্টার আবিষ্কার করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে আরেকটি সংবাদ শিরোনাম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে – "Sonia Bashir Kabir to represent Bangladesh in Science and Technology sector at United Nations" (The Daily Star), "Sonia to represent B'desh at UN Technology Bank" (The New Age), "জাতিসংঘের টেকনোলজি ব্যাংকে সোনিয়া বশির কবির" (প্রথম আলো)। সংবাদে বলা হয়"জাতিসংঘের টেকনোলজি ব্যাংকের গভর্নিং কাউন্সিলে মাইক্রোসফট বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোনিয়া বশির কবিরকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) জন্য টেকনোলজি ব্যাংকের হয়ে কাজ করবেন সোনিয়া বশির কবির।"বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের প্রতিটি শ্রমিক যদি একটু ইচ্ছে করে, তাহলে মাত্র ৬ মাস সঞ্চয় করে তাদের সন্তানকে ১৫/২০ হাজার টাকা খরচ করে একটি কম্পিউটার কিনে দিতে পারে এবং এর বিনিময়ে তাদের সন্তানদেরকে ও Bill Gates, Mark Zuckerberg, সোনিয়া বশির কবির কিংবা সালমান খান হওয়ার সূযোগ করে দিতে পারে।

আমার মনের কিছু আকুতি

আমার মনের একটি আকুতি আছে- **Love the people. Love the earth. Make it a heaven for all** - মানুষকে ভালবাসুন। পৃথিবীকে ভালবাসুন। সবার জন্য স্বর্গ গড়ূন। বেঁচে থাকার জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্ববাসীর

জন্য শুধুমাত্র একটিই পৃথিবী আছে। এখানে মানুষ কেন মানুষের শত্রু হবে। মতাদর্শের ভিন্নতা, ধর্মের ভিন্নতা, দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা, এমনকি শারীরিক গঠনের ভিন্নতা - সমাজে, রাষ্ট্রে কিংবা বিশ্ব সমাজে থাকতেই পারে। সেই "ভিন্নতা" তো "শত্রুতা" হতে পারে না। পৃথিবীতে কয়জন বাবা-মা আছে, যারা সন্তানের মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে সন্তানকে ত্যাগ করতে পেরেছে। পৃথিবীতে কয়জন ভাই-বোন আছে, যারা ভাই-বোনের মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে ভাই-বোনকে ত্যাগ করতে পেরেছে।

হতে পারে আমার এই কথাগুলো একেবারেই কাল্পনিক এবং বাস্তবতার দিক দিয়ে একেবারেই অসম্ভব। তবুও "অসহিষ্ণুতা" ও "অবিশ্বাস" –এর নিষ্ঠুর বাস্তবতার বিপক্ষে এবং বিশ্ববাসীর জন্য শান্তি ও কল্যাণের প্রত্যাশায়, অন্তত আত্মতৃপ্তির জন্য, অতবড় এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র এক প্রাণী হিসেবে আমার আকুতি ভরা কথাগুলো লিখে গেলাম। মতাদর্শের ভিন্নতা, ধর্মের ভিন্নতা, দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা, এমনকি শারীরিক গঠনের ভিন্নতা ইত্যাদিকে যদি মানব সমাজ ***"বিশ্ব বৈচিত্রের সৌন্দর্য" (Beauty of the Universal Diversity of the Human Society)*** হিসেবে মনে প্রাণে স্বাগত জানাতে পারে, তাহলে পৃথিবীটা সত্যিই সবার জন্য স্বর্গ হতে পারে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "সহনশীলতার মাধ্যমেই আমরা চলে আসি মহত্ত্বের কাছাকাছি"।

মানবসমাজে শান্তি- শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মানুষে মানুষে পারস্পরিক বিশ্বাস, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্মানবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সমাজে মানুষে মানুষে সৌহার্দ ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করার জন্য সামাজিক মূল্যবোধ অনেক গুরুত্তপূর্ণ। ছোটদের প্রতি যদি বড়দের স্নেহ থাকে আর বড়দের প্রতি যদি ছোটদের সম্মানবোধ থাকে, তাহলে সমাজে হিংসা, হানাহনি অনেকটা কমে যাবে। আজকে সমাজে কেমন যেন একটা পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মানুষের পাশে মানুষ দাঁড়ানো কিংবা কেউ কারো কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হবার চেষ্টা মনে হয় ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।

পৃথিবীর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীগুলোর সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার জন্য, পৃথিবীর ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীরগুলোর সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টাটুকু ও কম গুরুত্তপুর্ন নয়। সহিংসতা সহিংসতাই বয়ে আনে। তা কখনোই বিশ্ববাসীর জন্য সুখ ও শান্তি বয়ে আনতে পারে না। এই লক্ষে বিশ্ববাসীর মধ্যে ব্যাপক গনসচেতনতা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত ও গুরুৎপূর্ণ। ব্যাপক গণসচেতনতা পরিবর্তনের জন্য অনেক বড় একটি শক্তি। একটি জিনিস যা আজকে বাস্তবে অসম্ভব বলে মনে হয়, ব্যাপক গণসচেতনতার কারণে কালকে তা সম্ভব হতে ও পারে।

আসলে **"দারিদ্র্য"** - কেবলমাত্র **"দারিদ্র্য"** এবং **"জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ"** কেই বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা উচিৎ, আর মানব সমাজের সবচেয়ে বড় এই শত্রুদের কাছ থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য, বিশ্বের মানুষগুলো যদি একে অপরকে ভালবাসে, এই ভূমন্ডল, এই মাটি ও প্রকৃতিকে ভালবাসে, তাহলে ক্ষুধা, দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাংগামা, ঘৃণা, হিংসা-হানাহানিতে লিপ্ত কিংবা শিকারে পরিণত লক্ষ-কোটি মানুষের জন্য এই পৃথিবীতেই স্বর্গ নির্মাণ করা সম্মভব,
আমার মনের আরও আকুতি আছে- পৃথিবীর সব শিশুরা স্কুলে যাক, কলেজে যাক, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাক। পৃথিবীর সব মুকুলই প্রস্ফুটিট হোক। ওরা সু-শিক্ষায় শিক্ষিত হোক। পৃথিবীতে সম্মানের আসন তাদের জন্য নির্ধারিত থাকে, যারা জীবনে শিক্ষা, বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, সততা ও অভিজ্ঞতার ধাপগুলো সফলভাবে পার করতে পারে। বিশ্ব

বরেণ্য নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছিলেন "Education is a powerful weapon which you can use to change the world - শিক্ষা একটি শক্তিশালী অস্ত্র যা আপনি বিশ্বকে পরিবর্তন করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। ওরা বিশ্বাস করুক - Beauty in simplicity.Beauty in purity. Beauty lies in the lap of nature – "সরলতাই সৌন্দর্য", "বিশুদ্ধতাই সৌন্দর্য", "সৌন্দর্য প্রকৃতিরই কোলে"। ইংরেজ কবি P.B. Shelley বলেছিলেন 'Beauty is truth, truth beauty,' সৌন্দর্যই সত্য, সত্যই সৌন্দর্য। সত্যের মৃত্যু নেই। কাগজের ফুল থেকে কখনো সৌগন্ধ বের হবে না। পৃথিবীর শ্রেষ্ট আদালত মানুষের বিবেক। লোভ, হিংসা ও অহংকারেরে উর্ধ্বে উঠে বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকার শিক্ষায় ওরা শিক্ষিত হোক। ফুল যদি আসল হয়, ছিড়ে গেলে ও সুগন্ধ ছড়াবে। ওরা আরও বিশ্বাস করুক – Intellect is beauty – প্রজ্ঞাই সৌন্দর্য, No technology, No prosperity - যেখানে প্রযুক্তি নেই, সেখানে সমৃদ্ধি নেই - এই মন্ত্রগুলোতে দিক্ষীত হয়ে ওরা শিক্ষা, প্রযুক্তি, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা দিয়ে বিশ্বের জন্য শান্তি, সুখ এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক।

"আমি পাথরে ফুল ফুটাবো ভালবাস দিয়ে। আমি সাগরের ঢেউ থামাবো ভালবাসা দিয়ে" -গেয়েছিলেন শিল্পী অ্যান্ড্রু কিশোর আলম খানের সুরে, বাংলা মুভিঃ শেষ ঠিকানায়। বিশ্বের প্রতিটি মেহেনতি মানুষ যদি শিক্ষা, প্রযুক্তি, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা – এই হাতিয়ারগুলোকে নিয়ে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যাপিয়ে পড়ে, তাহলে মরুভুমিতে ও সফলভাবে ফসল ফলানো সম্ভব এবং অনেক অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।#

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার: যদিও অনেক তথ্য ওপেন সোর্স থেকে নেয়া হয়েছে, তবে "বাংলাদেশ প্রতিদিন"- এর বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে অধিকাংশ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে)

ফ্যাক্টরীর ফায়ার ড্রিলের সমাবেশে জিএম অপারেশন একটি কথা প্রায়ই বলতেন- এক মুঠ ভাত কম খেয়ে হলে ও সন্তানদেরকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের চাবিকাঠি হচ্ছে "শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া ভালভাবে প্রযুক্তি শিখা এবং কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা সহজ নয়। শিক্ষা ছাড়া ভালভাবে দায়িত্ত পালন করার সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভভ নয়। ফায়ার ড্রিল সমাবেশে একদিন তিনি বললেন যে গ্রুপের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় সিদ্ধান নিয়েছেন যে ফ্যাক্টরির যেসব শ্রমিক কর্মচারীদের সন্তানরা স্কুলে লেখাপড়া করছে তাদের জন্য মাসিক একটি স্টাইপেন্ড চালু করা হবে। অতি ক্ষুদ্র আকারে হলে ও এই আর্থিক সহযোগিতা তাদের স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েদেরকে অনেক বড় অনুপ্রেরণা যোগাবে।

তিনি আরো বলতেন "বাস্তবতার দিক দিয়ে একেবারে অসম্ভব হলে ও আমরা সবাই মিলে এমন একটি সময়ের কথা কি কল্পনা করতে পারিনা যখন বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের সাথে জড়িত ৪৫ লক্ষ্য শ্রমিক কর্মচারী মাসে অন্তত তিরিশ টাকা বিজিএমইএ অথবা বাংলাদেশ সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয়- এর কাছে একটি বিশেষ "শিক্ষা ফান্ডে" জমা রাখবে। সেই ফান্ড দিয়ে সরকার বাংলাদেশের ৪৮৯ উপজেলায় ৪৮৯ সাইন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি কলেজ এবং ৪৮৯ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করার "প্রক্রিয়ার" সুচনা করবে এবং সেই প্রক্রিয়ায় সরকার, বিজিএমইএ এবং একর্ড / এলায়েন্স ভূক্ত বায়াররা ও প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেবে। গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীদের এই মহৎ উদ্দ্যোগ দেখে, জাহাজ শিল্প, চামড়া শিল্প, ঔষধ শিল্প, কৃষক, সরকারী কর্মচারী সহ অন্যান্য পেশার মানুষেরা এরকম ব্যতিক্রম ধর্মী কার্যক্রমের পদক্ষেপ হাতে নেবে। আর ঐ সব কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখা পরা করে বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা পদ্মা ব্রিজ, সোনাদিয়া গভীর সমদ্র বন্দর, মংলা পোর্ট, তাপ বিদ্যুত কেন্দ্রের মত দেশের বিভিন্ন মেগা প্রকল্পগুলুর বাস্তাবায়নে নেতৃত্ব দেবে।

আমরা জানি, বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের আনুমানিক ৮০% লোক কমপক্ষে ৮ম শ্রেণী কিংবা ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপরা করার ও সুযোগ পায়নি। তবে আমরা মনে করতে পারি যে এই ফ্যাক্টরি ও আমাদের জন্য ভালো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে ও আমাদের প্রতিদিন কিছু না কিছু শেখার সুযোগ আছে। উদাহরণ স্বরূপ, এখানে ও সুইং ফ্লোরে একজন হেল্পার অপেরাটরের কাছ থেকে কাজ শিখছে, অপারেটর সুপারভাইজরের কাছ থেকে শিখছে, সুপারভাইজর লাইন চিফের কাছ থেকে শিখছে, লাইন চিফ ফ্লোর ইনচার্জের কাছ থেকে শিখছে। ফ্লোর ইনচার্জ এপিএম বা পিএমের কাছ থেকে শিখছে, পিএম তার সিনিয়র বা জিএমের কাছ থেকে শিখছে বা নির্দেশনা নিচ্ছে। ঠিক একই ভাবে, কোয়ালিটি, কাটিং, ফিনিশিং, নিটিং, ডায়িং, মার্চেন্ডাইজিং, আইই, প্লানিং, মেইনটেনেন্স, অ্যাডমিন, কমপ্লায়েন্স সহ প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে জুনিয়ররা সিনিয়রের কাছ থেকে কোনো না কোনো বিষয়ে কারিগরী শিক্ষা নিচ্ছে। সুতরাং ফ্যাক্টরির এই শিক্ষা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি, তাহলে এতে শুধু নিজেরা উপকৃত হব না, বরং ফ্যাক্টরি, সমাজ তথা দেশ উপকৃত হবে।

গার্মেন্টস শিল্পের সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের মাঝে ব্যাপক গণ সচেতনতা, প্রচুর আর্থিক ক্ষয় ক্ষতি ও দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, কাটিং সেকশনে "শেডিং" এর কারণে প্রচুর কাপড় অনেক সময় রিজেক্ট হয়ে যায়। শেডিং সমস্যা সমাধানের অনেক প্রক্রিয়া থাকলে ও অন্তত সহজ একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে

অতিরিক্ত "শেডিং" ফেব্রিক্সের প্রতিটি বেচের প্রতিটি রোল থেকে সুয়াচ নিয়ে ব্লাঙ্কেট তৈরী করে শেড ওয়াইজ সেগ্রিগেট করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া কিংবা পার্টসগুলু অবিচ্ছিন্ন রেখে ব্লক বা গ্রুপ কাটিং করা, ফেব্রিক্সের চেইন তৈরী করা সহ এই সহজ প্রক্রিয়াগুলুর দিকে না গিয়ে এবং কাপড়গুলু বাঁচানোর কোনো চেষ্টা না করে অনেক সময় অনেকে অনেক কাপড় অযত্নে অবহেলায় ওয়েস্টেজ করে ফেলে। অথচ এক কেজি নিট কাপড়ের মূল্য ৭/৮ ডলার থেকে ১৩/১৪ + ডলারের মত। এরকম প্রতিটি সেকশনেই বিভিন্ন অযত্নে অবহেলায় আনুমানিক ১৫ / ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কাপড় ওয়েস্টেজ হয়ে যায়।

গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে অযত্ন-অবহেলার আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে - সাধারণত নতুন লেআউট, কিংবা লাইন ব্যালেন্সিং অথবা মেশিনের মেকানিকাল সমস্যার কারণে প্রতিদিন সুইং ফ্লোরে এক লাইন থেকে অন্য লাইনে মেশিনগুলো আনা নেওয়া করার প্রয়োজন হয়। মেশিনগুলো সহজভাবে এনং দ্রুত আনা নেওয়া করার জন্য সুইং ফ্লোরে পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্রলি থাকে। এতদসত্ত্বেও, মেইনটেনেন্স স্টাফ এবং সুপারভাইজাররা ট্রলি ব্যবহার না করে মেশিনগুলো টেনে হিঁচড়ে এক লাইন থেকে অন্য লাইনে নিয়ে যায়। এতেকরে অনেক দামী এই মেশিনগুলো দিয়ে যেখানে ছয় / সাত বছর ভালভাবে কাজ করা যাবে, সেখানে মাত্র দুই / তিন বছরের মধ্যে মেশিনগুলো অকেজো হয়ে যায় কিংবা বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে যায় এবং সেগুলোর পার্টসগুলো না বদলায়ে চালানোর মত অবস্থা থাকে না। এভাবে বাংলাদেশের সব গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলুর ব্যাপারে হিসাব করলে দেখা যাবে যে কেবল মাত্র মেইনটেনেন্স স্টাফ ও সুইং স্টাফদের অবহেলা আর অযত্নের কারণে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা নষ্ট হচ্ছে।

অন্যদিকে ২৫ / ৩৫ কেজি ওজনের এই মেশিনগুলো টানতে গিয়ে যে কোনো সময় মেইনটেনেন্স স্টাফ বা সুইং স্টাফদের বড় ধরনের শারীরিক ক্ষতি (যেমন কোমরে ব্যথা বা হাতে - পায়ে আঘাত বা ব্যথা) হয়ে যেতে পারে। এমনকি চির দিনের জন্য পঙ্গু ও হয়ে যেতে পারে।

জিএম অপারেশন তার বক্তৃতায় আর ও বলতেন – "পৃথিবীতে পরিশ্রমী মানুষের জন্য দুটি বড় পুরষ্কার আছে, একটি হচ্ছে "সুস্বাস্থ্য" যা পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এবং অন্যটি হচ্ছে "অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি"। ঘাম মানুষের রক্ত বাঁচায় এবং ঘামের অপর নাম "সুস্থ জীবন"। তিনি আরও বলতেন –"গার্মেন্টস শিল্পের জীবনী শক্তি ক্ষয়কারী অনেক কারণগুলোর মধ্যে দুটি বড় কারণের একটি হচ্ছে ফ্যাক্টরিতে আভ্যন্তরীণ দলাদলি-রেষারেষি যেখানে অনেক সময় কতিপয় স্টাফ নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকে যা ফ্যাক্টরির কার্যক্রমে মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। অন্যটি হচ্ছে ফ্যাক্টরির পার্শবর্তী এলাকার স্থানীয় মাস্তান - চাঁদাবাজরা। এই মাস্তান – চাঁদাবাজরা একটু ইচ্ছে করলে ফ্যাক্টরিতে চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে এবং কাজের মধ্য দিয়ে দক্ষতা অর্জন করে নিজের জীবন গড়তে পারে। কিন্তু তারা সেই সু-পথে না গিয়ে "কাজ না করে চাঁদাবাজি - মাস্তানি করে বাবুগিরি করে বেড়ানোর সহজ পথ (?) টিই" তারা বেছে নেয়। তারা জানে এবং বিশ্বাস করে যে ফ্যাক্টরি চালাতে হলে তাদের দয়া-মায়ার উপর নির্ভর করে চালাতে হবে, নতুবা তারা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে, যে ফ্যাক্টরি আর চালানো যাবে না।

শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি, বিভিন্ন কাচামালের মূল্য বৃদ্ধি, পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি সহ নানান খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে বর্তমানে একটি ফ্যাক্টরি চালানো খুবই কঠিন। ফ্যাক্টরির এই ব্যয় ভার মেটানোর জন্য

মালিকদেরকে অনেক ক্ষেত্রে ঝুট-লেফটওভার বিক্রি উপর নির্ভর করতে হয়। অথচ ঐ সব চাঁদাবাজ - মাস্তানরা মনে করে, ফ্যাক্টরির ঝুট- লেফটওভার এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। বি খরচে - বিনা পরিশ্রমে পাওয়া আলাউদ্দিনের চেরাগ। অথচ ফ্যাক্টরির মালিকদেরকে শত কষ্ট-পরিশ্রমের শত কোটি টাকা বিনিয়াগ করে, তাদের বিনিয়াগটি নিরাপদ রাখার জন্য কত নির্ঘোম রাত কাটাতে হয়, তা ঐ চাঁদাবাজ-মাস্তানরা কিন্তু জানে না। তবে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, মানুষের কল্যানের জন্য যে রাজনীতি এবং দেশের উন্নতি-সমৃদ্বির জন্য যে রাজনীতি, সেই রাজনীতির নাম ভাঙিয়েই কিন্তু ঐসব চাঁদাবাজ-মাস্তানরা দেশের একটি জীবনী শক্তির মত শিল্প খাতের এত বড় ক্ষতি এরা নির্দ্বিধায় করে চলেছে। এর ফলে বাংলাদেশে এরকম অসংখ্য ফ্যাক্টরি আছে, যেগুলু কেবলমাত্র এসব কারণে হয় বন্ধ হয়ে গেছে নতুবা এখনো অর্ধমৃত অবস্থায় খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে”।

=৬=

দীর্ঘদিন ধরে রুনা, স্বপ্না আর সাবিনাদের বড় আশা- কোন ছুটির দিনে ঢাকায় হাতিরঝিল দেখতে আসবে। সেদিন রবিবার কি সোমবার রাত্রে টেলিভিশন দেখার সময় সংবাদে জানতে পারল যে অস্ট্রেলিয়ার সিডনী অপেরা হাউসের মতোই মনোমুগ্ধকর বিশ্বমানের অপেরা হাউস হচ্ছে হাতিরঝিলে। দৃষ্টিনন্দন এ ঝিলের মাঝামাঝি একটি কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করে সেখানে ঢাকার চোখ ও নির্মাণ করা হচ্ছে।

সংবাদে বলা হয়, ভাসমান এমপিথিয়েটারের নির্মাণ কাজ অতিদ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যাবে। এমপিথিয়েটারের কাছেই ১০ তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক গাড়ি পার্কিং ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এ ভবনে গাড়ি পাকিং-এর সুবিধা ছাড়াও একটি সম্মেলন কক্ষ, হাতিরঝিলের ইতিহাস সংক্রান্ত যাদুঘর, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য সুবিধা থাকছে। হাতিরঝিলে ভাসমান রেস্টুরেন্টও করা হচ্ছে এবং ব্যাটারি চালিত ওয়াটার স্কুটার চালু করা হবে। হাতিরঝিল প্রকল্পের ১০ একর জায়গার ওপর নির্মিত হচ্ছে এই অপেরা হাউস। যা হবে একটি আন্তর্জাতিকমানের বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। একই সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবেন দর্শকরা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কোর অপেরা হাউসের অবকাঠামো নির্মাণ করছে। প্রকল্প এলাকায় থাকবে একটি বিশেষ (সুভিনিয়র) শপ। যেখানে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য তুলে ধরা হবে। এখানে সমকালীন বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া নতুন শিল্পীদের জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমিও গড়ে তোলা হবে হাতিরঝিল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে।

উল্লেখ্য, বিশ্বে সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থাপত্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সিডনির অপেরা হাউস। যা অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বন্দরে অবস্থিত। এটি দেখতে নৌকার পাল আকৃতির। সারা বছর অনেক ধরনের অনুষ্ঠান এখানে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের কোটি কোটি পর্যটকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এই সিডনি অপেরা হাউস। অপেরা হাউসটি মহাসাগরের এক প্রান্তে তৈরি করা হয়েছে। দেখতে অনেকটা উপত্যকার মতো। ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় এটিকে ২০০৭ সালে অন্তর্ভুক্ত করে।

সংবাদটি শেষ হওয়ার পর রুনা, স্বপ্না ও সাবিনারা ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে পরবর্তী ছুটির দিন শুক্রুবার সকালে ঢাকায় হাতিরঝিলে বেড়াতে আসবে ঠিক করল এবং পরদিন সকালে ফ্যাক্টরিতে গিয়ে কমপ্লায়েন্স ম্যানেজার নাজরানা চৌধুরীকে ও তাদের সাথে হাতিরঝিলে বেড়াতে আসার জন্য অনুরোধ করার পর তিনি সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলেন।

শুক্রুবার সকালেই তারা গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে বাসে করে রওয়ানা দিল। গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে হাতিরঝিলের দূরত্ব আনুমানিক ২৫ কিলোমিটার এবং যানজট না থাকলে সাধারণত এক ঘন্টায় পৌছা যায়। কিন্তু সেই ছুটির দিনে ও রাস্তার প্রচন্ড যানজটের কারণে হাতিরঝিল পৌছতে তাদের প্রায় চার ঘন্টা পার হয়ে গেল।

এর আগে কখনো ওরা হাতিরঝিলে আসেনি। এই প্রথমবারের মত হাতিরঝিলের সৌন্দর্য দেখে ওরা মুগ্দ। এটি নগর বিনোদনের নতুন এক প্রাণকেন্দ্র। অনাবিল সৌন্দর্য আর দৃষ্টিনন্দন লেক। এঁকেবেঁকে চলা রাস্তা, সড়কদ্বীপে রঙিন ফুল মন না মাতিয়ে পারে না। হঠাৎই চোখ আটকে যায় নৌকা বাইচে! তাও ইট-কাঠ আর কংক্রিটের এ নগরীতে। এ কী! রাজহাঁসের জলকেলিও তো চলছে! না! একে তো ঢাকা মনে হচ্ছে না! ঢাকার মধ্যে এ যেন এক স্বপ্নপুরী। এটি দেশের বিনোদনের সবচেয়ে বড় ও নান্দনিক স্থাপনা।

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সালের ২০০৭ সমীক্ষায় এ প্রকল্পের পরিকল্পনা হয় (বুয়েট) বাছাই শে-টি যাচাইমাঝামাঝি। প্রকল্প হওয়ার পর ওই বছরেরই ৮ অক্টোবর একনেকের সভায় এটি অনুমোদন পায়। প্রাথমিক অবস্থায় এর ব্যয় ধরা হয়েছিল এক হাজার ৪৮০ কোটি ৯৮ লাখ টাকা। ২০০৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় এবং প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয় ২০০৯এর- জুন মাসে এ প্রকল্পের কাজ শেষ করার। কিন্তু ২০০৯এর জুনে শেষ হওয়ার কথা- থাকলেও জমি অধিগ্রহণ, বাড়িঘর উচ্ছেদ আর একাধিকবার নকশা বদলের কারণে এর বাস্তবায়নে ঘটেছে অনাকাক্সিক্ষত বিলম্ব। এ ছাড়াও আদালতে ঝুলে থাকা অনেক মামলাও নিষ্পত্তিতে সময় লেগেছে। তবে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেগুনবাড়ী- রঝিল প্রকল্পেরহাতি মেয়াদ আরো দুই বছর বাড়িয়ে ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত ধরা হলেও ২০১৩ শালের ২ জানুয়ারি বুধবার এটির উদ্বোধন করা হয়। শেষ পর্যন্ত এর ব্যয়ভার দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৯৭১ কোটি টাকা।

লেকের পাশে নির্মিত ভিউইং ডেক, সবুজে আচ্ছাদিত রাস্তার মেডিয়ান, ওয়াকওয়ের (হাঁটাপথ) পাশে গার্ডেনিং, ফুলে ফুলে শোভিত রাস্তার আইল্যান্ড, লেকের ধারে সবুজের সমারোহ আর স্বচ্ছ পানির রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়া। অনেকটা কল্পনার মতো। আর এ ধরনের কল্পনা যানজটে পিষ্ট ঢাকায় বসে চিন্তার অতীত। হাতিরঝিলের এ এলাকায় নগরবাসী যাতে নির্বিঘ্নে পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুরতে পারেন সেজন্য দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। হাতিরঝিলের স্বচ্ছ জলাশয় দেখার জন্য রয়েছে ভিউইং ডেক। সবুজে আচ্ছাদিত রাস্তা ধরে গাড়ি নিয়ে ছুটে চলার পাশাপাশি রয়েছে ওয়াকওয়ে গার্ডেনিং। রাস্তার উপরে নির্মিত ফুটওভার ব্রিজ ধরে যে কেউ উপভোগ করতে পারবেন দৃষ্টিনন্দন হাতিরঝিল জলাশয়। এক হাজার ৯৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে সেনাবাহিনীর স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন-পশ্চিমের (এসডব্লিউও-পশ্চিম) ১৬ ইঞ্জিনিয়ার্স কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন (১৬ইসিবি)। প্রকল্পের নাম : হাতিরঝিল প্রকল্প। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। প্রকল্প তত্ত্বাবধানকারী: রাজউক, এলজিইডি, ওয়াসা এবং বুয়েট। প্রকল্প জরিপ ও নকশা প্রণয়নকারী সংস্থা: বুয়েট। মোট জমির পরিমাণ: ৩০২ দশমিক ৮৭ একর। মোট বাজেট: এক হাজার ৯৭১ কোটি টাকা। প্রকল্প শুরু : ২০০৭ সালের ৮ অক্টোবর। প্রকল্পের উদ্বোধন : ২ জানুয়ারি ২০১৩। *(কৃতজ্ঞতা স্বীকার: প্রবন্ধ "হাতিরঝিলে নৌকাবাইচ রাজহাঁসের জলকেলি" বাংলানিউজ।)*

হাতিরঝিল ঘুরতে ঘুরতে এক সময় নাজরানা চৌধুরী, রুনা, স্বপ্না ও সাবিনারা ফুস্কা খাওয়ার জন্য এক জায়গায় বসে পড়ল। রুনা বলল – আজকে সকালে গাজিপুর থেকে আসার পথে প্রচন্ড যানজটে প্রায় তিন ঘন্টা সময় নষ্ট না হলে আমরা আর ও অনেক ভাল সময় এখানে কাটতে পারতাম।

কথাটি শুনে স্বপ্না বলল – যানজট তো আমাদের জীবনের দুঃস্বপ্নের একটি অংশ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রার পথে যানজট ও বহুলাংশে দায়ী।

তখন নাজরানা চৌধুরী বললেন –২০১২ সালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, রাজধানীতে যানজটের কারণে প্রতিদিন ক্ষতি হচ্ছে ৫৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। আর প্রতিবছর ক্ষতি হচ্ছে ১৯ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা। প্রতিদিন নষ্ট হচ্ছে ৩২ লাখ কর্মঘণ্টা। প্রতি ঘণ্টায় নষ্ট হচ্ছে ১ লাখ ৩৩ হাজার ৩০০ কর্মঘণ্টা। ইউএনডিপি 'এর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতিবছর ঢাকায় যানজটে সাধারণ মানুষের যে সময় নষ্ট হয়, তা টাকার অঙ্কে ২০০ কোটিরও বেশি। একদল নগরবিদের মত, ট্রাফিক কনজেশন বা যানজটের কারণে বছরে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে ২০ হাজার কোটি টাকার। এ ছাড়া পরিবেশগত ক্ষতি হচ্ছে আরো দুই হাজার ৫০০ কোটি টাকার।

সাধারণত একটি শহরের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ জায়গা যেখানে রাস্তা ঘাটের জন্য থাকতে হয়, সেখানে ঢাকায় আছে মাত্র ৬ থেকে ৭ শতাংশ। যার ফলে অসহনীয় যানজটে জনজীবনে কষ্ট, দুর্ভোগ, ভোগান্তি বেড়েই চলেছে। প্রতিনিয়ত যানবাহন বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যস্ত নগরী ঢাকা আজ চলাফেরার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। বেপরোয়া হারে বাড়ছে যানবাহন। জন ঘনবসতির রাজধানী ঢাকার অলিগলি থেকে শুরু করে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কেই হরহামেশা দূর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে অফিসগামী, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে জরুরী হাসপাতালগামী রোগীরা পর্যন্ত। ৪০০ বছরের ঐতিহ্য ঢাকার প্রতিটি দৃষ্টিনন্দন স্থান পর্যবেক্ষণে আজ পর্যটকরা পর্যন্ত অস্বস্তি প্রকাশ করছে এই যানজটের কারণে। অকল্পনীয় এবং ভয়াবহ যানজটের কারণে ঢাকা শহরে মোটরচালিত যানবাহনের গতি ঘণ্টায় গড়ে পাঁচ কিলোমিটারেরও কম। আর এরই সাথে সময়ের পাশাপাশি অপচয় হচ্ছে শ্রমেরর। প্রায় ৮০ শতাংশ প্রাইভেটকারের উপস্থিতি রাজধানীতে যানজটের অন্যতম কারণ। একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, রাজধানীর মোট রাস্তার ৫৪.২ শতাংশ জায়গা দখলে রাখে প্রাইভেটকার। আর সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের -বিআরটিএ হিসাবে, ২০০৮ সালের জুন থেকে ২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত রাজধানীর রাস্তায় ৩৭ হাজার ৭০৫টি নতুন গাড়ি যুক্ত হয়েছে।

একটি পরিসংখ্যান মতে গত দশ বছরে শুধু রাজধানীতে যানবাহন রেড়েছে দুই লাখ বার হাজার একশ তিনটি। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নিয়ে কাজ করা একদল গবেষকের মতে, এই যানজটের জন্য প্রতিদিন ৩২ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। এতে সরকারি যানবাহন অপারেটর এবং শিল্পমালিকদের গড়ে দুই হাজার করে মোট ৪ হাজার কোটি

টাকা ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। রাজধানীর ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে আইইবির সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন এই পরিসংখ্যানটি তুলে ধরেন।

ঢাকার অসহনীয় যানজট শুধু বিভিন্ন সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুই নয়, এটি একইসঙ্গে ব্যক্তিগত, স্বাস্থ্যগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা সমস্যাও তৈরি করছে। নগরবাসী মাত্রই জানেন, তীব্র যানজটের ফলে ঢাকার বাসযোগ্যতা, পরিবেশবান্ধব আবহাওয়া এবং বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসবের ফলে কেবল ঢাকা বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে না, এরসঙ্গে ভয়াবহ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বাংলাদেশ।

যানজটের কারণে আর্থিক ক্ষতি এবং সময় অপচয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শব্দ ও বায়ুদূষণ। বিভিন্ন প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বলা যেতে পারে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নগরবাসী। উচ্চশব্দের কারণে বিপুল সংখ্যক শিশুর শ্রবণশক্তি হ্রাস পাচ্ছে, এমনকি অনেক শিশু বধির ও বিকলাঙ্গ হচ্ছে। দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা। আর যানবাহনের বিষাক্ত কার্বন ক্ষয় করছে ওজোনস্তর। সেই সঙ্গে ঢাকাবাসী আক্রান্ত হচ্ছে হাঁপানি, যক্ষ্মাসহ নানা ধরনের রোগে।

১৯৯৩ সালে রাজধানীতে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে লোকসংখ্যা ছিল ৭০ লাখ, আর বর্তমানে ১ কোটি ২৭ লাখে এসে ঠেকেছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন উন্নয়ন পরিকল্পনার -ডিএমডিপি প্রাক্কলন হিসেব অনুসারে ২০১১ সালে ঢাকার জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪২ লাখ আট হাজার। প্রতিদিন নতুন মানুষ আসছে ২ হাজার ১৩৬ জন। নগরীতে যে হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে, সে হারে কিন্তু আয়তন বাড়েনি। এরপরও অব্যাহতভাবে নির্মাণ হচ্ছে বহুতল ভবন, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস ও আবাসন। আর এসব স্থাপনার বেশিরভাগেরই নেই নিজস্ব
এসে ঠেকেছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন উন্নয়ন পরিকল্পনার -ডিএমডিপি প্রাক্কলন হিসেব অনুসারে ২০১১ সালে ঢাকার জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪২ লাখ আট হাজার। প্রতিদিন নতুন মানুষ আসছে ২ হাজার ১৩৬ জন। নগরীতে যে হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে, সে হারে কিন্তু আয়তন বাড়েনি। এরপরও অব্যাহতভাবে নির্মাণ হচ্ছে বহুতল ভবন, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস ও আবাসন। আর এসব স্থাপনার বেশিরভাগেরই নেই নিজস্ব
পার্কিং ব্যবস্থা। ট্রাফিক অব্যবস্থাপনাও যানজটের কারণ। ট্রাফিক পুলিশ সিগন্যালের তোয়াক্কা না করে একই পয়েন্টে আধঘণ্টা পর্যন্ত একদিকের যানবাহন আটকে রাখে। অনেক সময় অটো সিগন্যাল বাতিতে যানবাহন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। সবুজ বাতির বদলে ট্রাফিক পুলিশের হাত যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছে। মূলত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা অনেকাংশে ভেঙে পড়েছে। তাছাড়া ঢাকার রাজপথে ও ফুটপাথের বড় একটা অংশ অবৈধ দখলদারদের অধীনে রয়েছে। এই অবৈধ দখলদারদের সঙ্গে পুলিশও জড়িত বলে অনেকের ধারণা। এটাও যানজটের একটা কারণ।

যানজটের কারণে ঢাকা শহরে কি ক্ষতি হচ্ছে, এটা একটি চিত্র। কিন্তু সারা দেশে বিভাগীয় শহর, জেলা শহর সহ বিভিন্ন শহর - উপশহরগুলুতে যানজটের কারণে কি পরিমান ক্ষতি হচ্ছে এটা কল্পনা ও করা যায়না।

নাজরানা চৌধুরী আর ও বললেন - পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় পরিবহন ব্যবস্থাপনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাত্র ছয় বছর আগে ১৯৬৫ সালে সিঙ্গাপুর স্বাধীনভাবে পথ চলা শুরু করে আজকে পৃথিবীর অনিয়তম একটি ধনী দেশে পরিণত হয়েছে। সিঙ্গাপুর পুরো দেশটি ঢাকার চেয়ে ছোট। সিঙ্গাপুরের আয়তন মাত্র ৭১৯.১ বর্গ কিলোমিটার আর ঢাকার আয়তন মাত্র ৮১৫.৮ বর্গ কিলোমিটার। সিঙ্গাপুরের মূলমন্ত্র: "*Majulah Singapura*", "*Onward, Singapore*" অর্থাৎ "সিঙ্গাপুর, এগিয়ে যাও" - এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় সুষ্ঠ ও সুবিন্যস্ত পরিবহন ব্যবস্থাপনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সিঙ্গাপুরে রয়েছে পরিবহন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ম কানুন। সরকার সেখানে সেই কঠোর নিয়ম কানুনগুলো প্রযোগ করতে পারছে, কারণ সে দেশের জনগণ ঐ কঠোর নিয়ম নীতিকে দেশ ও দশের জন্য আশীর্বাদ মনে করে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর একটি যুদ্ধ বিধস্ত জাপান কিভাবে **"5 – S"** মূলনীতি সামনে রেখে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা, পরিশ্রম ও কৃচ্ছতার মধ্য দিয়ে আজকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতীক হতে পেরেছে। সেগুলো পৃথিবীর যেকোনো গরিব দেশ অনুসরণ করে অর্থনৈতিক সমৃদ্দির উচ্চ শিখরে আরোহন করতে পারে।**"5 – S"** হচ্ছে একটি কর্মস্থলকে (কিংবা এলাকা বা দেশ) সুশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেখানে সব কিছু সুবিন্যস্ত থাকবে এবং টেকসই হবে। "5S" এর পূর্ণাঙ্গ রূপ হচ্ছে, জাপানি ভাষায় : **Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu,** এবং **Shitsuke** - অর্থাৎ "সুবিন্যস্ত করা", " সুশৃঙ্খলভাবে রাখা", "উজ্জ্বল করে রাখা", "মান বজায় রাখা" ও "টেকসই করা"।

নাজরানা চৌধুরী আর ও বললেন – আমাদের সমাজ ব্যবস্থা সহ নানা কারণে আমরা কখনো কল্পনা ও করতে পারিনা যে আমাদের সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কিংবা অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ (CIP), কিংবা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কখনো পাবলিক বাসে চড়বেন। অবশ্য উনাদের প্রতিটি সেকেন্ড সময়ের মূল্য অনেক বেশি এবং উনাদের সময়ের সময়ের সর্বোচ্ছ সদব্যবহার বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার জন্য অনেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, যারা সময় বাঁচানোর প্রয়াজনে প্রাইভেট কার ব্যবহার করেন, তাদের চাইতে কেবলমাত্র বিলাসিতার জন্য প্রাইভেট কার ব্যবহার করেন, তাদের সংখ্যা হাজারগুন বেশি।

আমরা কখনো কল্পনা করতে পারিনা যে আমাদের একজন মাননীয় মেয়র কখনো পাবলিক বাসে চড়ছেন। তবু ও বিনা প্রয়াজনে প্রাইভেট কারের পরিবর্তে পাবলিক বাস ব্যবহারের জন্য জনগণের মধ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মাসে দুই মাসে একবার করে ও যদি পাবলিক বাসে উনারা চড়েন, এটার একটা অনেক বড় ইতিবাচক প্রভাব মানুষের মধ্যে পড়বেই। মানুষ জানে, উনারা প্রাইভেট গাড়িতে চড়বেন কিংবা গাড়ির বহর নিয়ে চলবেন।কিন্তু উনারা ও পাবলিক বাসে চড়তে পারেন – এটা সবার জন্য ভিন্ন একটি আকর্ষণ এবং উনাদের বাসে চড়ার বিষয় ও সংবাদ মাধ্যমের হেডলাইন হবে।এতে করে উনাদের প্রতি গণ মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা অনেকগুন বেড়ে যাবে।

সাবিনা তখন বলল– আমরা উল্লেখযোগ্য কিছু করতে না পারলে ও, অন্তত একটা কাজ করতে পারি। প্রতি মাসে অন্তত ছুটির দিনে একবার আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে মহাসড়কের পাশে যে কোনো দৃশ্যমান জায়গায় বিনা প্রয়াজনে প্রাইভেট কার ব্যবহার না করার অনুরোধ নিয়ে কিছু ব্যানার - ফেস্টুন নিয়ে অন্তত একঘন্টা দাঁড়ায় থাকতে পারি। আমরা যদি এই কর্মসূচিকে আমাদের জীবনেরই একটি অংশ হিসেবে নিয়মিত চালিয়ে যাই এবং এই আলোর মশালটি ধরে রাখি, হয়ত এমন ও হতে পারে যে আমাদের এই প্রচেষ্টা, আমাদের এই আবেদন দেশ ও সমাজের গন্য - মান্য, জ্ঞানী -গুণীজনদের মধ্যে কারো না কারো হৃদয় স্পর্শ করতে পারে, তখন তাদের সামান্য প্রচেষ্টায় দেশে বড় ধরণের জনসচেতনতা সৃষ্টি হতে পারে এবং ধীরে ধীরে এই ধরণের উদ্দ্যোগ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর –উপশহরগুলুতে ও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার: "বাংলাদেশ প্রতিদিন"- এর বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে অধিকাংশ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে)

=৭=

রুনা ও স্বপ্নার এক বান্ধবী সালেহা আনুমানিক তিন কিলোমিটার দূরে একটি ফ্যাক্টরিতে চাকরি করে। একটি ছুটির দিনে রুনা ও স্বপ্না সালেহার বাসায় বেড়াতে যায়। সালেহার বাসা মহাসড়কে একটি বাজার থেকে সামান্য ভিতরে। সালেহার বাসা থেকে ফেরার পথে রুনা ও স্বপ্না বাজার থেকে একটু দূরে রিক্সার জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা যেখানে দাড়ায়ছিল তার একটু দূরে ছাদবিহীন একটি পাকা ঘর। বাজারের লোকজন সাধারণত ঐ ঘরটিকে ময়লা ফেলার ডাস্টবিন বানিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ একটি দৃশ্য দেখে রুনা ও স্বপ্নার মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। ওরা দেখতে পেল ঐ ময়লা ফেলার ঘরটির পিছনের দেওয়ালের সাথে বেড়ার একটি খুপরি ঠেস দেওয়া। সেই খুপরির সামনে ভাঙা লোহা লক্কর দিয়ে বানানো একটি দোলনা। সেই দোলনাতে দের / দুই বছরের একটি ছেলে শুয়ে আছে। দোলনার পাশে ১৩/১৪ বছরের একটি মেয়ে, (মনে হয়) তার ছোট ভাইটাকে এক হাতে পাখা দিয়ে বাতাস করছে এবং অন্য হাতে একটি বই পড়ছে।

রুনা এবং স্বপ্না ওদের কাছে গিয়ে মেয়েটির নাম জিজ্ঞাসা করল এবং ওর মাবাবা কোথায় গেছে জানতে চাইল। মেয়েটি বলল, তার নাম সাদিয়া এবং তার মা বাজারে দোকানে কাজ করতে গেছে। তবে বাবা কোথায়, তা আর বলল না। একটু পরে মা হালিমা কিছু খাবার নিয়ে আসল।

হালিমার বাচ্চা দুটির প্রতি রুনা ও স্বপ্নাদের আন্তরিকতা দেখে হালিমার চোখে পানি চলে আসল। দুজনকে কোনমতে একটু বসার ব্যবস্থা করে হালিমা বাচ্চাটাকে ঘুম থেকে তুলে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করল। এই কথা সেই কথা বলতে বলতে, হালিমা তার জীবন যুদ্দের করুন কাহিনীর কিছু কথা বলার চেষ্টা করল – লেখাপড়া করেছি ইন্টারমেডিয়েট পর্যন্ত। অভাব অনটনের কারণে ডিগ্রিটা নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে আমার বিয়েটা হয়েছিল একটি ভাল পরিবারে। আমাদের গ্রামটি ছিল শহর থেকে অনেক দূরে। আজ থেকে আট / দশ বছর আগে সেখানে আধুনিকতার ছুঁয়া খুব একটু লাগেনি। কয়েকটি গ্রামের জন্য একটি হাটবাজার ছিল এবং সেই বাজারটি ছিল আমাদের গ্রামে। বাজারে সবচেয়ে বড় দোকানটি ছিল আমার স্বামীর। পুরো বাজার মিলে, শুধুমাত্র আমার স্বামীর দোকানেই একটি টেলিভিশন ছিল।

আমার স্বামীর নাম মুখতার। সে ছিল অত্যন্ত রাগী। মাঝে মধ্যে আমার স্বামীর দোকানে বাজারের লোকজন টেলিভিশন দেখতে আসত। একদিন কোন একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান দেখার জন্য অনেক মানুষ আমার স্বামীর দোকানে আসল। আমার স্বামী তখন দোকানে ছিলনা। শুধু কর্মচারীরা ছিল। আমার স্বামী এসে দেখে, সে যেই স্থানে বসে, সেই স্থানে একজন বৃদ্ধ লোক বসে টেলিভিশন দেখতেছে। তার বসার জায়গায় আরেকজন লোক বসে আছে দেখে মুখতারের মাথা বিগড়ে গেল। সে দৌড়ে গিয়ে বৃদ্ধ লোকটিকে মারার জন্য হাত তুলল। লোকটি

প্রথমে হতভম্ব হয়ে যায়। পরে মুখতারের এত বড় বেয়াদবি দেখে নিচের দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থেকে চলে আসার জন্য উঠে দাঁড়াল এবং তখন তার চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা পানি পড়ল। সেই দিন থেকে মুখতারের জীবনের অধঃপতন শুরু। এক বছর যেতে না যেতেই দোকানটি বিক্রি করে মুখতার নেশা শুরু করল। দোকান বিক্রির টাকা শেষ হওয়ার পর নেশার টাকা যখন যোগাড় করতে পারতনা, তখন আমার বাড়ি থেকে টাকা এনে দেওয়ার জন্য আমার উপর অত্যাচার করত। আমার বাবা মা নেই। অনেক আগে মারা গেছে। আমার দুই ভাই, তারা তাদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। আমার দিকে তাকানোর সময় তাদের নেই। এরপর আমরা গ্রামের বাড়ি ছাড়লাম। দূরে এক জায়গায় এসে আমি মানুষের বাসা-বাড়িতে কাজ করে কোনোভাবে সংসারটি বাঁচায় রাখার চেষ্টা করছিলাম।

একদিন রাত্রে আমার স্বামী বাসায় আসেনি। সকাল বেলা কোত্থেকে এসে আমার কাছে টাকা চাইল। দেখলাম সে নেশার জন্য পাগল হয়ে গেছে। আমার হাতে তখন মাত্র পাঁচশটি টাকা। সেই টাকা দিয়ে চাল-ডাল এবং বাচ্চাদের জন্য কিছু অন্যান্য খাবার ও কিনতে হবে। সাদিয়ার জন্য একটি বই ও কিনতে হবে। এই পাঁচশো টাকা তাকে দিয়ে দিলে, বাচ্চা দুটোকে না খেয়ে থাকতে হবে। আমি টাকা দিইনি। এর পর বাচ্চা দুটোর সামনে সে আমাকে মারধর করতে লাগল। এরপর তার জামা কাপড়গুলু সহ আমি তাকে ঘর থেকে বের করে দিই। সাদিয়া তখন বার বার কান্নাকাটি করে আমাকে বলছিল– মা, তুমি বাবাকে বের করে দিয়ো না। আমরা না খেয়ে থাকবো, সমস্যা নেই। তুমি বাবাকে টাকা দাও। আমি কোনো কথা শুনিনি। আমি দেখলাম, ও ঘরে থাকলে আমি, বাচ্চা দুটোকে মানুষ করতে পারবনা। আমার জীবন তো শেষ। এখন অন্তত বাচ্চা দুটোর জীবন আমাকে বাঁচাতে হবে। তাদেরকে মানুষ করতে হবে।

এর পর বাবা যখন বের হয়ে যাচ্ছিল, তখন ছোট ছেলেটা বাবার জামাটি টেনে ধরে বাবাকে আটকানোর চেষ্টা করছিল। আর তখন সাদিয়ার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল -

বাবা আমার বাবা

মোঃ খোরশেদ আলম

"মন্দ হোক ভালো হোক বাবা আমার বাবা
পৃথিবীতে বাবার মতো আর আছে কেবা?"
শুনে ছিলাম বহু আগে কোনো একটি গানে
অবশেষে বুঝতে পেরেছি পঙ্ক্তির মানে।
মর্মে মর্মে বাজে বেদনার সুর হৃদয়ের ক্ষতে

সূর্য ডুবে গেলে পৃথিবীর বুকে চাঁদ নেমে আসে
বাবা আমার বাবা বুঝেছি সেতো আর আসবেনা ফিরে।

আমার স্বামী চলে যাওয়ার কিছুদিন পর আরেকটি ঘটনা ঘটল। আমি একটি বাড়িতে কাজ করতাম। একদিন বাড়িওয়ালি সকালে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করল। তার একটি স্বর্ণের হার নাকি হারিয়ে গেছে। ঐ বাড়ির বড় ছেলে নিশা করত। আমার ধারণা হল, সেই হারটি বাড়ির বড় ছেলে চুরি করেছে। কিন্তু, আমার ধারণা দিয়ে কার কি এসে যায়। ঐ হারটি চুরির পুরো দূর্ণামটি আমার উপর এসে পরে। বাড়িওয়ালি প্রতিবেশী কয়েকজন গণ্য মান্য লোক ডেকে সালিশ বসাল। সালিশে আমাকে অনেক নাজেহাল করা হল। শেষ পর্যন্ত অনেক নাজেহাল করে আমাকে ছেড়ে দেয়। এর পর থেকে আমি ঐ বাসাটি ছেড়ে দিয়ে এদিকে চলে এসেছি। অতবড় পৃথিবীতে তো আমার ঠাই নেই, তাই বাচ্চা দুটোকে নিয়ে এখানে মাথা গোজার চেষ্টা করছি।

এতক্ষন রুনা আর স্বপ্নার মুখে কোন কথা নেই। হালিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু। তাদের চোখ দিয়ে শুধু অনবরত অশ্রু ঝরছিল।

সব শেষে রুনা এবং স্বপ্না হালিমাকে তাদের সাথে চলে যেতে বলে এবং তারা তাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে হালিমার জন্য একটি চাকরি ব্যবস্থা করবে বলল এবং সেখানে দিনের বেলায় ছেলেটি ফ্যাক্টরির ডে-কেয়ার সেন্টারে থাকবে এবং সাদিয়া ভাল একটি স্কুলে লেখাপড়া করতে পারবে। রুনা এবং স্বপ্নার কথাটি শুনে হালিমা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। সাথে সাথে সে তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল যে বাজারে দোকানগুলোতে তার কিছু টাকা পয়সা পাওয়ার আছে, সেগুলো নিয়েই সে পরদিন রুনার বাসায় চলে আসবে।

ফ্যাক্টরিতে চাকরি হওয়ার এক সপ্তাহ পর, হালিমা সাদিয়াকে নিয়ে একটি স্কুলে আসল। স্কুলে এসে সে প্রধান শিক্ষকের সাথে দেখা করে সাদিয়াকে ভর্তি করে দিল। প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে হালিমা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রধান শিক্ষকের কাছে আরজ করল – ছোট বেলায় স্বপ্ন ছিল জীবনে একদিন লেখাপড়া করে অনেক বড় হব। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। যে স্বপ্ন আমার জীবনে পূরণ হয়নি, সেই স্বপ্নটি যেন আমার মেয়ের জীবনে পূর্ণ হয়, এই আশীর্বাদটুকু যদি করেন, তাহলে সারা জীবন আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

কথাগুলু বলতে বলতে, হালিমা তার ছোট্ট ব্যাগটি থেকে সযত্নে ভাজ করা এবং লেমিনেটিং করা একটি কাগজ প্রধান শিক্ষককে দিতে দিতে বলল – ছোটবেলায় আমার স্কুল জীবনে যেদিন এই লেখাটি দেখেছি, সেদিন থেকে এই কাগজটি আমার সাথে আছে। জীবনের এতোগুলু দুর্যোগে কত কিছু আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে, কিন্তু এই কাগজটি আমি কোনোদিন হারাই নি। আপনার কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ, আমার মেয়েটি যেন সেই মহামানব Abraham Lincoln এর চিটির আদর্শে মানুষ হয়।

কাগজটি ছিল ১৮৬১-১৮৬৫ সালের আমেরিকার প্রেসিডেন্টে Abraham Lincoln এর। যেদিন তিনি তার ছেলেকে প্রথম বারের মত স্কুলে পাঠিয়েছিলেন, সেদিন তিনি ছেলের শিক্ষকের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি নিম্নরূপ:

Abraham Lincoln letter to his son's teacher:

"Dear Sir,

My son starts school today. It is all going to be strange and new to him for a while and I wish you would treat him gently. It is an adventure that might take him across continents. All adventures that probably include wars, tragedy and sorrow. To live this life will require faith, love and courage.

So dear Teacher, will you please take him by his hand and teach him things he will have to know, teaching him – but gently, if you can, Teach him that for every enemy, there is a friend. He will have to know that all men are not just, that all men are not true. But teach him also that for every scoundrel there is a hero, that for every crooked politician, there is a dedicated leader.

Teach him if you can that 10 cents earned is of far more value than a dollar found. In school, teacher, it is far more honorable to fail than to cheat. Teach him to learn how to gracefully lose, and enjoy winning when he does win.

Teach him to be gentle with people, tough with tough people. Steer him away from envy if you can and teach him the secret of quiet laughter. Teach him if you can – how to laugh when he is sad, teach him there is no shame in tears. Teach him there can be glory in failure and despair in success. Teach him to scoff at cynics.

Teach him if you can the wonders of books, but also give time to ponder the extreme mystery of birds in the sky, bees in the sun and flowers on a green hill. Teach him to have faith in his own ideas, even if every one tell him they are wrong.

Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone else is doing it. Teach him to listen to every one, but teach him also to filter all that he hears on a screen of truth and take only the good that comes through.

Teach him to sell his talents and brains to the highest bidder but never to put a price tag on his heart and soul. Let him have the courage to be impatient, let him have the patient to be brave. Teach him to have sublime faith in himself, because then he will always have sublime faith in mankind, in God.

This is the order, teacher but see what best you can do. He is such a nice little boy and he is my son."#

=৮=

সুলতানা ঐ ফ্যাক্টরিতে দীর্ঘদিন ধরে অপারেটর হিসেবে কাজ করে। তার তের বছর বয়সী রুমানা নামের একটি মেয়ে আছে। তার স্বামী সাইফুল আরেকটি ফ্যাক্টরিতে আয়রনমেন হিসেবে কাজ করে। হঠাৎ একদিন সুলতানা রমিজ নামের একটি ছেলের সাথে সম্পর্ক করে, স্বামী সংসার ফেলে চলে যায়। এদিকে সাইফুল মেয়ে রুমানাকে নিয়ে বড়ই বিপদে পরে গেল। বাসায় রান্না-বান্না করা, মেয়েকে সকালে স্কুলের জন্য প্রতিদিন তৈরি করা ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত একটি কাজের মহিলাকে দিয়ে সাইফুল বাসার সাংসারিক কাজগুলো কোনোভাবে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছিল। কয়েক মাস যেতে না যেতেই কাজের মহিলাটা ও একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে হেল্পার - এর চাকরি নিয়ে চলে যায়।

আসলে শিল্পাঞ্চল হওয়ার কারণে, ঐ এলাকাতে কাজের মহিলা পাওয়া খুবই কঠিন। কাজের মহিলাটা চলে যাবার পর, সাইফুলের মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ল। বিশেষ করে মেয়ে রুমানাকে সামলানো অনেক কঠিন হয়ে যায়। সাইফুল বুঝতে পারতেছে যে তার মেয়ে রুমানার লেখাপড়ার মারাত্মক ব্যাঘাত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সবার পরামর্শক্রমে রুবি নামের একটি মেয়েকে সাইফুল বিয়ে করল বিশেষকরে তার মেয়ে রুমানার দেখাশুনা করার জন্য।

বিয়ের পর কয়েক মাস সব কিছু ভালোই চলছিল। সাইফুল বিভিন্নভাবে যাচাই করে দেখে যে রুবি তার মেয়ে রুমানাকে সত্যিই খুবই ভালবাসে। রুমানার খাওয়া দাওয়া, স্কুলের জন্য সকাল বেলা তৈরি করা ইত্যাদি। তবে সাইফুলের মন যে বিষয়টি দেখে একেবারেই গলে যায়, তা হল প্রতিদিন সকাল বেলা রুবি নিজেই রুমানাকে স্কুলে নিয়ে যায়, আবার ছুটি হওয়ার আগেই প্রতিদিন স্কুলে পৌঁছে যায় এবং রুমানাকে অনেক আদর -যত্ন করে বাসায় নিয়ে আসে। রুমানাকে খাওয়া দাওয়া করানোর পর তাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেয়। সন্ধ্যাবেলা আবার তাকে ঘুম থেকে তুলে, মুখ হাত ধুয়াই দিয়ে নাস্তা করায়ে পড়ার টেবিলে বসে যায়। বাসার আশেপাশে লোকজনগুলো রুবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অনেকে এসে সাইফুলকে বলে, রুমানা সত্যিকারের একটি মা পেয়েছে। আর রুবির জন্য অনেকে মন ভরে দোয়া করে।

কিন্তু রুমানার কপালে সুখ বেশি দিন সৈলনা। কয়েক মাস যাওয়ার পর রুবির আচার-আচরণে পরিবর্তন আসতে থাকল। সাইফুল যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, শুধু ততক্ষন রুমানা একটু স্বস্তি পায়। অন্যান্য সময় ডেকসি -পাতিল ধোয়া, রান্নার কাজের সব যোগান দেওয়া, কাপড় চোপড় ধোয়া সহ ঘরের সব কাজই রুমানাকে করতে হয়। সারাদিনে এত খাটুনির পর যখন রুমানা খেতে বসে, তখন অল্প কিছু ভাত এবং অল্প কিছু তরকারি রুবি নিজেই রুমানাকে দিয়ে, ভাত তরকারির ডেকসিগুলু উপরে তুলে রাখে। রুমানা এই ছোট্ট বয়সে শত চেষ্টা করে ও তার লেখাপড়ার জন্য একটু সময় বের করতে পারে না। আর রুবির পুরো সময়টুকু কাটে টেলিভিশনের এই সিরিয়াল, সেই সিরিয়াল দেখতে দেখতে। রুমানা এই কষ্টের কাহিনীগুলো বাবা কিংবা অন্য কাউকে বলার

কোনো উপায় খোঁজে পায়না, কারণ সে জানে, তার বাবা কিংবা অন্য কেউ যদি জানতে পারে, তাহলে তার সৎ মা রুবি তার আস্ত রাখবে না।

তবে সাইফুল যখন ঘরে আসে, তখন রুমানার প্রতি রুবির ভালোবাসা দেখানোর কমতি থাকে না। আবার প্রতিবেশীদেরকে দেখানোর জন্য, রুবি ঠিকই প্রতিদিন রুমানাকে আগের মত স্কুলে দিয়ে আসে এবং ছুটি শেষে নিয়ে আসে।

একদিন রুবি রুমানাকে কি যেন কেনার জন্য দোকানে পাঠায়। রুমানা দোকান থেকে ফেরার পথে রাস্তায় পড়ে থাকা একটি ছেড়া কাগজে একটি ছবির দিকে তার চোখ যায়। ছবিতে দেখে, একটি মা পাখি কি যেন খড়কুটো ঠোঁটে নিয়ে তার সন্তানের মুখে তুলে দিচ্ছে। রুমানা ছবিটির দিকে অনেক্ষন তাকিয়ে থেকে, তারপর কাগজটি তুলে নিয়ে কাদা মাটিগুলু ছবির কাগজ থেকে ঝেড়ে ফেলল এবং কাগজটি সুন্দর করে ভাজ করে বাসায় চলে এসে তার বালিশ আর কভারের মাযখানে যত্ন করে রেখে দিল। প্রতিদিন রুমানার ছবিটি দেখার ইচ্ছে হয় কিন্তু রুবির ভয়ে বাসায় দেখার সাহস করতে পারে না। তাই প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সময় ঐ ছবিটি তার বইয়ের ভিতরে ভাজ করে নিয়ে স্কুলে নিয়ে যায়। স্কুলে দুপুরে ছুটির সময় স্কুলের উঠানে একটু দূরে একটি গাছের গোড়ায় বসে বইটি খুলে, বই পড়ার ভান করে ছবিটি দেখে দেখে কাঁদে। রুমানা ও বুযতে পারে যে, তার কান্না, তার চোখের পানি কিছুটা হলেও তার কষ্টের পাহাড়টি একটু হালকা করে দেয়। আর এই চোখের পানি ছাড়া তার কষ্ট হালকা করার অন্য কোন উপায় নাই।

সুলতানা তার মেয়ে রুমানাকে ফেলে চলে গেলেও একেবারে ভুলে যায়নি। সুলতানা কয়েক মাস যাবার পর প্রতি মাসে তার এক বান্ধবী সুফিয়ার কাছে মেয়ের জন্য কিছু টাকা পাঠানোর কথা চিন্তা করল। সুলতানা বিষয়টি সুফিয়াকে বলার পর সুফিয়া রুমানার সাথে দেখা করার চিন্তা করল। সুলতানা সুফিয়াকে আর ও বলল ”আমার মেয়েটাকে একটু দেখার জন্য আমার মনটা ছটফট করছে। আমার মনে হচ্ছে, আমার মেয়েটার জন্য আমার কলিজাটা ছিরে যাচ্ছে। ভুল যা করার, তা আমি করে ফেলেছি। এটা এখন শুধরানোর কোনো পথ আমার হাতে নেই। তুমি অন্তত তোমার মোবাইলে আমার মেয়েটার একটি ভিডিও চিত্র ধারণ করে আমার কাছে পাঠাতে পার কিনা দেখ’। সুলতানা চলে যাওয়ার পর থেকে সুফিয়া কখনো রুমানাদের বাসায় যায়নি। বাসায় গিয়ে রুমানার সাথে দেখা করলে কিংবা টাকা পয়সা দিলে তা সৎ মায়ের কারণে রুমানার জন্য বিপদ হতে পারে। তাই সুফিয়া দুপুরে ছুটির সময় স্কুলে এসে রুমানার সাথে দেখা করার কথা মনে মনে স্থির করে।

একদিন দুপুরে ছুটির একটু আগে, সুফিয়া রুমানাদের স্কুলে এসে পৌঁছল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে, রুমানা কোনদিকে যায় তা দেখার চেষ্টা করতে লাগল। সুফিয়া দেখতে পেল, স্কুলের ছুটির ঘন্টা বাজার সাথে সাথে ক্লাস রুম থেকে সব ছেলেমেয়েরা বের হয়ে যাবার পর, রুমানা ধীরে ধীরে একা স্কুলের উঠানে একটু দূরে

সেই গাছের নিচে উলটো পাশে গিয়ে বসল, যাতে করে তাকে যেন কেউ ভালোভাবে দেখতে না পারে। সুফিয়া দূর থেকে আঁচ করল যে রুমানা বইটি খুলে, কোন একটা কাগজের উপর অত্যন্ত আদরকরে হাত বুলাইতেছে। সুফিয়া ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে রুমানার উল্টো পাশে গাছের নিচে দাঁড়াল।

সুফিয়া দেখল, রুমানা মা পাখির তার ঠোঁট দিয়ে সন্তানের মুখে খড়কুটো তুলে দেওয়ার ছবিটির উপর অত্যন্ত আদর করে হাত বুলাচ্ছে, আর তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে এবং তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে সেই গান-

মায়ের মত আপন কেহ নাই

শিল্পীঃ রুমানা ইসলাম
গীতিকারঃ খান আতাউর রহমান

মায়ের মত আপন কেহ নাই রে
মায়ের মত আপন কেহ নাই
মা জননী নাইরে যাহার
ত্রিভুবনে তাহার কেহই নাইরে।।

এই দুনিয়ায় নয়ন মেলে
মাগো তোমায় দেখেছি
তোমার বুকে হেসে খেলে
তোমার কথাই শিখেছি।

তাই তো বলি তোমার মত
মরমী কেউ নাই মাগো
তোমার মত আপন কেহ নাই রে
মায়ের মত আপন কেহ

আমি আঘাত পাইলে তোমার চোখ নামে পানি
সেই পানিতে ধুয়ে মাগো কোলেতে লও টানি।

তুমি যেদিন থাকবে না মা
সেদিন আমার হবে কি
সুখে থাকি দুঃখে থাকি
কাহার আসবে যাবে কি।

তাই তো বলি তোমার মত
দরদী কেউ নাই মাগো

তোমার মত আপন কেহ নাইরে
মায়ের মত আপন কেন নাই রে
মায়ের মত আপন কেন নাই।।

সুফিয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রুমানার ভিডিও করবে। তাই আশেপাশে লোকজন যেন ভিডিও করার বিষয়টি আঁচ করতে না পারে, সেই জন্য, সে তার মোবাইলটিকে নিচু হাতে আগে থেকে এমন করে ধরেছিল, যাতে করে ভিডিও ও ঠিক মত হয় আর কেউ তা আঁচ ও করতে পারবে না। রুমানা যখন ক্লাস রুম থেকে বের হচ্ছিল, তখন থেকে সুফিয়া তার মোবাইলে ভিডিও করা শুরু করেছিল এবং গাছের নিচে রুমানার পুরো দৃশ্যটি ভিডিও করল। রুমানার কান্না ভরা গানটি শেষ হওয়ার পর, সুফিয়া রুমানার কাছে গিয়ে তার পাশে বসল। সুফিয়াকে দেখে রুমানার কান্না বেড়ে গেল। সুফিয়া রুমানাকে বুকে জড়িয়ে ধরে থাকল এবং তার চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ছিল। এভাবে অনেক্ষন থাকার পর, সুফিয়া তার ব্যাগ থেকে কিছু খাবার বের করে রুমানাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই রুমানা কিছু খেল না।

রুমানাকে বিদায় দিয়েই সুফিয়া সুলতানাকে ফোন করে ফ্যাক্টরির কাজ শেষে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আসার জন্য বলল। কিন্তু সুলতানা কোন কথায় শুনলনা। সুলতানা না পৌঁছা পর্যন্ত সুফিয়াকে স্কুলের পাশে অপেক্ষা করতে বলল। সুলতানা পৌঁছার পর মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতেই সুফিয়া মুখে কোন কথা না বলে, তার মোবাইলে পুরো ভিডিও চিত্রটি দেখাল।

ভিডিও চিত্রটি দেখার পর সুলতানা একেবারে পাগলের মত হয়ে গেল। সুলতানা সুফিয়াকে বলল, যেকোন ভাবেই হোক, স্কুলের শিক্ষকের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে রুমানাকে এক্ষনি বের করে আনার জন্য। সুফিয়া বুযতে পারল যে, রুমানাকে এখন না দেখলে সুলতানা পুরো পাগল হয়ে যাবে, তাই সে স্কুলের ভিতরে গিয়ে, রুমানার ছুটির ব্যবস্থা করে রুমানাকে স্কুলের বাহিরে নিয়ে আসল। সুলতানা মেয়ে রুমানাকে দেখা মাত্রই এমনভাবে বুকে জরিয়ে ধরল, এ এক অন্য রকম করুন দৃশ্য। মা -মেয়ের কান্না দেখে আশে পাশে যে কয়জন লোক ছিল তাদের কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না।

এর পর সুলতানা তার নতুন স্বামী রমিজকে ফোন করে বলল যে তার মেয়ে খুবই কষ্টে আছে। তাই সে মেয়েকে ছাড়া থাকতে পারবে না। রমিজ যদি তা মানতে না পারে, তাহলে সে তার মেয়েকে নিয়ে আলাদা বাসায় একা থাকবে। রমিজ বুযতে পারল যে সুলতানা সিদ্বান্ত বদলাবে না, তাই সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুলতানাকে মেয়েকে নিয়ে বাসায় চলে আসতে বলল। সেখান থেকে সুলতানা মেয়েকে নিয়ে বাজারে গিয়ে মেয়ের জন্য জামা কাপড় সহ অন্যান্য জিনিসপত্র কিনে বাসায় ফিরল।

সুলতানাদের গ্রামে চিকিৎসা সমস্যা একটি বড় সমস্যা। রুমানার জন্মের পর থেকে, সুলতানার মেয়েকে ডাক্তার বানানোর স্বপ্ন ছিল। নতুন করে সেই স্বপ্ন পূরণের আশা নিয়ে পরদিন সকালে মেয়েকে পার্শ্ববর্তী একটি ভাল স্কুলে ভর্তি করায়ে দিল।

=৯=

নাজরানা চৌধুরী ফ্যাক্টরির কমপ্লায়েন্স ম্যানেজার। তার স্বামী আকবর চৌধুরী পার্শ্ববর্তী আরেকটি ফ্যাক্টরির জিএম – এডমিন এন্ড এইচআর। রুনা এবং স্বপ্না ফ্যাক্টরির WPC (Workers Participation Committee) এর সদস্য। কমপ্লায়েন্স ম্যানেজার হওয়ার সুবাধে ফ্যাক্টরির শ্রমিক -কর্মচারীদের সাথে যথেষ্ট নাজরানা চৌধুরীর সুসম্পর্ক রয়েছে। আর WPC- এর সদস্য হওয়ার কারণে রুনা এবং স্বপ্নার সাথে তার সুসম্পর্ক আর ও গভীর।

সাধারণত ফ্যাক্টরির ছুটির একটু আগে নাজরানা চৌধুরী ফ্যাক্টরির মূল ফটকের কাছে এসে দাঁড়ায়, যাতে করে সবাই সুশৃঙ্খলভাবে বিশেষকরে ছেলে ও মেয়েদের জন্য নির্ধারিত আলাদা আলাদা পথ দিয়ে শালীনতার মাধ্যমে বের হয় কিনা তা দেখাশুনা করার জন্য। তিনি হঠাৎ দেখলেন আলেয়া নামের একজন অপারেটরের সেন্ডেলের ফিতা ছিড়ে গেছে। একটু দূরে আলেয়ার ছেলে রায়হান ও রায়হানের স্ত্রী নাসিমা মায়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। মায়ের সেন্ডেলের ফিতা ছিড়ে গেছে দেখার সাথে সাথে রায়হান দৌড়ে এসে তার নিজের সেন্ডেল দুটো তাড়াতাড়ি খুলে মায়ের পায়ে দিয়ে দেয় এবং মায়ের ছেড়া সেন্ডেল দুটো একটি ঝাড়া দিয়ে নিজের হাতে তুলে নেয়। এদিকে রায়হানের স্ত্রী ও পিছু পিছু গিয়ে রায়হানের হাত থেকে তার শাশুড়ির ছেড়া সেন্ডেল দুটো নিতে চাইল, রায়হান তা না দিয়ে নিজেই খালি পায়ে হাঁটা দিল।

দৃশ্যটি দেখে নাজরানা চৌধুরীর কলিজাটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল। সে মনে মনে ভাবল, স্কুল – কলেজের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এই ছেলেটা মা কে যে কতটুকু ভালবাসে, এটা তো আজকাল হাজারটা শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের মধ্যে ও এরকম উদাহরণ পাওয়া যাবেনা এবং মাকে সম্মান করার এতটুকু শিক্ষা যে সে কোথায় পেল, তা তার মাথায় আসেনা। সাথে সাথে তার নিজের ছেলের কথা মনে পড়ল। তার একটি ছেলে ফয়সাল চৌধুরী এবং একটি মেয়ে ফারহানা চৌধুরী। ছেলে – মেয়ে দু জনকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রি পর্যন্ত লেখাপড়া করায়ছেন। পাঁচ বছর আগে ছেলে ফয়সালের জন্য ঘরে একটি বৌ এনেছেন। আর মেয়ে ফারহানা চৌধুরীকে প্রায় এক বছর আগে বিয়ে দিয়েছেন।

ছেলে ফয়সাল চৌধুরীর বিয়ের পর বাবা আকবর চৌধুরী অনেক টাকা পয়সা খরচ করে ট্রাভেলস এজেন্সির লাইসেন্স সহ একটি ব্যবসা দাঁড় করায় দিয়েছেন। বিয়ের প্রথম দু এক বছর, ফয়সাল চৌধুরী ও তার স্ত্রী নীলার আচার আচরণ ভালই ছিল। নীলা শশুর শাশুড়িকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করত। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের যতই উন্নতি হতে লাগল, ফয়সাল ও তার স্ত্রী নীলার আচার আচরণ ততই খারাপ হতে থাকল। ফয়সালের সব ভালবাসা ও আন্তরিকতা তার শ্বশুরবাড়ির দিকে মোড় নিতে থাকল এবং শত ব্যস্ততার মধ্যে ও প্রতি দু সপ্তাহ অন্তর অন্তর অনেক খাবার – উপঢৌকন নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে ছুটির দিনে বেড়াতে যেত। মা –বাবা একই ঘরে পাশের রুমেই থাকে, কিন্তু মা-বাবার সাথে খুব একটু কথা বলার সময় ফয়সালের হয়না। আর ফয়সালের বৌ নীলা, সে তো সব সময় টেলিভিশনের নাটক – সিনেমা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। শ্বশুর শাশুড়ি কি খেল, কি খেলনা তা

দেখার সময় নীলার নেই। বাসায় কাজের মেয়েরা সব রান্না বান্না করে টেবিলে রেডী করে দেওয়ার পর সে মুখ-হাত ধুয়ে খেতে বসে।

নাজরানা চৌধুরী ছেলে ফয়সালকে কাছে না পেলে ও ছেলের জন্য তার আগের শিডিউল বরাবরই ঠিক রেখেছেন। তিনি ফয়সাল ও ফারহানার ছোটবেলার অনেক জামাকাপড় ও খেলনা সযত্নে রেখে দিছেন। প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিনে তিনি তাদের সেই ছোটবেলার জামা কাপড় ও খেলনাগুলো ঝেড়ে ঝুরে পরিষ্কার করেন। জামা কাপড় যেগুলো ধুয়ার প্রয়াজন মনে করেন, সেগুলো নিজ হাতে ধুয়ে ফেলেন। ফয়সাল ও ফারহানার ছোটবেলা থেকেই নাজরানা চৌধুরী কখনো তাদের জামা কাপড় কাজের মেয়েদেরকে দিয়ে দিতেন না, তার সন্তানদের জামা কাপড় তিনি নিজেই ধুইতেন, আর সেই প্রক্রিয়া তিনি এখনো বজায় রেখেছেন। বাসার আবর্জনা মনে করে, ফয়সলের বৌ নীলা অনেকবার এই জামা কাপড় ও খেলনাগুলো ফেলে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু নাজরানা চৌধুরী তা ফেলতে দেননি।

পরবর্তী ছুটির দিন শুক্রুবার, ফয়সলের জন্মদিন। নাজরানা চৌধুরী ছেলে মেয়েদের জন্মদিন মোটামুটি ভালোভাবে পালন করেন। তবে বিগত কয়েকবছর ধরে ফয়সালকে তার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ঠিক মত পাওয়া যায়নি। কিন্তু, নাজরানা চৌধুরী ফয়সলের জন্মদিন পালন করা কখনো বন্ধ করেননি।

ফয়সলের জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে নাজরানা চৌধুরী রুনা ও স্বপ্নাকে ফয়সলের জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানের কথা বললেন এবং সাবিনা সহ আর ও কয়েকজনকে ছেলেমেয়ে সহ শুক্রুবার সকালে নাজরানা চৌধুরীর বাসায় চলে আসার জন্য বললেন।

সেদিন শুক্রুবার ফয়সালের জন্মদিন। সকাল দশটার দিকে ফারহানা ও তার স্বামী মনসুর চৌধুরী অনেক মিষ্টি – উপঢৌকন নিয়ে নাজরানা চৌধুরীর বাসায় এসে হাজির। মাকে জড়িয়ে ধরে ফারহানা বলল – মনসুরের ভাল একটা প্রমোশন হয়েছে। আগেতো সে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ছিল। গতকাল সে ম্যানেজার হিসেবে প্রমোশন পেয়েছে।

নাজরানা চৌধুরী সংবাদটি শুনে খুবই খুশি। পরক্ষনে তিনি মেয়ে ফারহানাকে জিজ্ঞাসা করলেন – আচ্ছা, একটু আগেই তো আমি তোর শাশুড়ীর সাথে কথা বললাম, তিনি আমাকে এই সুসংবাদটি দিলেন না কেন? তাহলে কি তিনি এটা শুনেন নি?

- না মা, মনসুর তো রাত্রে বাসায় পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে গেছে। আমরা আর সংবাদটি দিতে পারি নি।
-তাহলে আজকে সকালে উনাকে সংবাদটি না দিয়ে আমার এখানে চলে এসেছো কেন? এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কাছে উনার চাইতে এখন আমার গুরুত্ত অনেক বেশি।

পাশে দাঁড়ানো মনসুরকে উদ্দেশ্য করে, নাজরানা চৌধুরী বললেন – তোমার সুসংবাদ শুনে আমি খুশি হয়েছি সত্য, কিন্তু তোমার এই সুসংবাদটি তোমার মাকে না জানিয়ে সর্বপ্রথম আমাকে জানাতে এসেছো, এটা দেখে আমার মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। তোমার উচিত ছিল, তোমার সুসংবাদটি এমনকি ফারহানাকে জানানোর আগে তোমার মাকে জানানো উচিত ছিল এবং ফারহানা সুসংবাদটি তোমার কাছ থেকে শুনার পরিবর্তে তোমার মায়ের কাছ থেকে শুনলেই আমি খুশি হতাম। তুমি হয়ত ভুলে গেছ, আজকের তোমার সাফল্যের পথটি কিন্তু তোমার মা –বাবাই তৈরি করে দিয়েছিলেন। আজকে সাফল্যের যে মঞ্চে তুমি দাঁড়িয়েছ, সে মঞ্চটি নির্মাণ করেছিলেন তোমার মা –বাবা, আমি বা আমরা না। একটি কথা তুমি সারাজীবনের জন্য মনে রাখবে, আমি যদি সারা জীবন তোমার জন্য দোয়া – আশীর্বাদ করে একটি স্বর্গ নির্মাণ করি, সেই স্বর্গ তোমার মায়ের এক ফোটা চোখের পানিতে তছনছ হয়ে যাবে, তখন আমার দোয়া – আশীর্বাদ আর কোন কাজে আসবে না। আজকের এই ঘটনাটার জন্য মূলত আমার মেয়েই দায়ী এবং এই জন্য তুমি এক্ষনি ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও এবং আমি না ডাকা পর্যন্ত সে যেন কোন দিন এই বাসায় না আসে। আর তোমরা মিষ্টি –উপঢৌকন যা এনেছো, তা ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

ফারহানা মায়ের পরিস্থিতি বুযতে পেরে কাঁদতে কাঁদতে মনসুর সহ বাসা থেকে বের হয়ে গেল। আর তাদের পিছনে পিছনে কাজের মেয়েকে দিয়ে নাজরানা চৌধুরী মিষ্টিগুলো পাঠিয়ে দিল।

বাসায় পৌঁছার পর, মনসুর মায়ের কাছে আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে পুরো ঘটনাটি বলল এবং এটা ও বলল যে, ফারহানাকে ওখানে যেতে নিষেধ করে দিয়েছে। কথাগুলু শুনে মনসুরের মায়ের মনটি একদিকে আনন্দে ভরে গেল, কিন্তু সাথে সাথে ফারহানার জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বিকাল বেলা মনসুরের মা, মনসুর ও ফারহানাকে নিয়ে বাসায় আসল। ফারহানার মাকে মনসুরের মা অনেক অনুনয় -বিনয় করে ফারহানা ও মনসুরকে ক্ষমা করে দিতে বললেন এবং সাথে সাথে এটা ও বললেন যে তিনি এরকম একটি কঠিন শিক্ষা দিয়ে ছেলে -মেয়েদেরকে বাবা – মায়ের অনিচ্ছাকৃত অভিশাপ থেকে রক্ষা করেছেন, যা তাদের ভবিষ্যতের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াত।

সন্ধ্যার পর ফয়সাল বাসায় আসল। সে বুঝতে পেরেছে যে, আজকের সব আয়োজন তার জন্মদিন উপলক্ষে। কিন্তু, সে কারো সাথে দেখা করল না এবং কিছুক্ষন পর সে তার বৌ নীলাকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে চলে গেল।

অতঃপর, মনসুরের মা, মনসুর, ফারহানা, রুনা, স্বপ্না, সাবিনা ও তাদের ছেলে-মেয়েরা সহ সবাই মিলে একটি বিরাট কেক কেটে ফয়সালের জন্মদিনের অনুষ্ঠান শুরু করল। নাজরানা চৌধুরী আগে থেকে জানতেন যে ফয়সাল অনুষ্ঠানে থাকবে না, তাই তিনি আর এটা নিয়ে খুব বেশি মন খারাপ না করলে ও মনের অজান্তেই তার

মনটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল, কিন্তু সেই বেদনা লুকায় রাখার জন্য মুখে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করলেন। আর এই পরিস্থিতি দেখে রুনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসল –

আমি রজনীগন্ধা ফুলের মত
শিল্পীঃ সাবিনা ইয়াসমিন
সুরকারঃ সুবল দাস
গীতিকারঃ গাজী মাজহারুল আনোয়ার
ছায়াছবি: আমার এই ঘর যেন স্বর্গ

আমি রজনীগন্ধা ফুলের মত
গন্ধ বিলিয়ে যাই
আমি মেঘে ঢাকা চাঁদের মত
জোছনা ঝরিয়ে যাই
আমি গানে গানে প্রানের যত
বেদনা লুকাতে চাই।।

বুকের মাঝে যে বাঁশী
অকারনে বার বার
পায় না তো অধিকার।

আজও এ কথা আমি যে শুধুই।
নিজেকে বোঝাতে চাই।।

চলার পথে কাঁটা যে হতে
চাই নাকো আমি আর
ভুল ভাঙ্গে যদি তার।

আমি নিরবে ভাল যে বেসে।
নিজেকে পোড়াতে চাই।।

অনুষ্ঠানে খাওয়া দাওয়া শেষে নাজরানা চৌধুরী রুনা, স্বপ্না ও সাবিনাকে তার নিজের শোবার ঘরে ডেকে নিয়ে আসলেন। নাজরানা চৌধুরীর শোবার ঘরে ঢুকেই রুনা – স্বপ্নারা অবাক। পুরো ঘর জুড়ে ফয়সাল ও ফারহানার ছোটবেলার জামা কাপড় ও খেলনাগুলো খুব সুন্দরভাবে সাজানো। আর দেয়ালের মধ্যে বড় বড় তিনটি ফ্রেম সেট করা। ওখানে দুটি ফ্রেম হচ্ছে ফয়সালের, যার একটি তের বছর বয়সে স্কুল প্রতিযোগিতায় আঁকা চিত্রকর্ম আর একটি ফারহানার স্কুল জীবনের একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার পর সনদপত্র ও পুরস্কার গ্রহণের।

রুনা নাজরানা চৌধুরীর কাছে ঐ চিত্রকর্মের ব্যাপারে জানতে চাইল। নাজরানা চৌধুরী বললেন – এখানে প্রথম চিত্রকর্মে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, একটি ছোট্ট বাগান। পুরো বাগানটিকে একটি বিশাল আমগাছ ছায়া দিয়ে রেখেছে। আমগাছটির মূল অংশে ফয়সাল লিখেছে "বাবা" আর "বাবা" আর আমগাছের ডালগুলোতে এবং পাতাগুলোতে ফয়সাল লিখেছে "মা" আর "মা"। পুরো আমগাছটি কাঁচা পাকা আমে ভরপুর এবং অনেক ডাল আম সহ এত নীচু পর্যন্ত ঝুলে আসে যে মাটিতে দাঁড়িয়েই হাত দিয়ে আম নেয়া যায়। আমগাছের গোড়ালিটা ও বেশ বড় এবং চৌরা। সেখানে বসে বসে ফয়সাল আম খাচ্ছে। আর একটু দূরে ফারহানা একটি দোলনায় দুল খাচ্ছে। বাগানের পশ্চিম কোণার দিকে একটি মাটির টিলা আঁকা হয়েছে। সেখানে অনেক গাছ গাছালি। সেই টিলার পাদদেশে ছনের ছাউনি দিয়ে একটি কুঁড়ে ঘর আঁকা হয়েছে। কুঁড়ে ঘরে বেড়াগুলো অর্ধেক করে দেয়া। সেখানে একটি টেবিলে অনেক ফলমূল এবং পাশে বই, খাতা ও কলম সাজিয়ে রাখা। ফয়সাল এই পেইন্টিংয়ের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছে যে আমাদের পরিবারটি ছোট্ট একটি বাগান এবং এই বাগানটিতে ওর বাবা এবং আমি সব কিছু তাদের সুখ শান্তির জন্য সাজিয়ে রেখেছি।

আর দ্বিতীয় চিত্রকর্মটি হচ্ছে - নাজরানা চৌধুরীর বিয়ের পর অনেক বছর তাদের সংসারে সন্তান আসেনি। একটি সন্তানের জন্য প্রায়ই স্বামী স্ত্রী দু জনেই খোদার কাছে প্রার্থনা করতেন। একদিন একজন বৃদ্ধ ফকির তাদেরকে বললেন – " আপনারা দুজনই সূর্যোদয়ের আগে নদীতে এক গলা পানিতে নেমে সন্তানের জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করলে, হয়ত খোদা আপনাদেরকে সন্তান দান করতে পারেন'।

সেই ফকিরের পরামর্শ অনুসারে পরদিন তাদের কাছের একটি নদীতে এক গলা পানিতে নেমে খোদার কাছে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করলেন। সেই বছরই ফয়সলের জন্ম হয়। নাজরানা চৌধুরী ফয়সলদেরকে ছোটবেলা থেকে এই কাহিনীটি অনেক বার বলেছেন। আর ফয়সাল সেটি পরবর্তীতে এই চিত্রকর্মে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে।

পারিবারিকভাবে নাজরানা চৌধুরী একটি যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। সম্প্রতি তিনি ভাইদের সাথে সমঝোতায় পৌঁছার পর অনেক সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ঐ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ জায়গা ও যদি তিনি বিক্রি করেন, তাহলে তা দিয়ে তিনি এখন যেখানে আছেন সেখান থেকে একটু দূরে গ্রাম এলাকায় কমপক্ষে চার / পাঁচ বিঘা জমি ক্রয় করতে পারবেন। আর সেখানে অন্তত দু বিঘা জমিতে যদি বেশ কিছু বাসা বাড়ি নির্মাণ করেন, তাহলে প্রতি মাসে অন্তত কয়েক লাখ টাকা ঘর ভাড়া পাবেন। ছেলে ফয়সাল ও তার স্ত্রী নীলার অনাদর-অবহেলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি মনে মনে, একই পরিস্থিতির শিকার মহিলাদেরকে নিয়ে একটি মহিলা প্রবীণ নিবাস প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে নিয়েছেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করার চিন্তা করেছেন "মাতৃছায়া" , যার উপনাম থাকবে "সিস্টার্স অব মার্সি বা "Sisters of Mercy"। এর মর্মার্থ দাঁড়াবে – মায়ের ছায়ায় দয়াময়ী বোনেরা। তারা বিপদগ্রস্তদের নিরাপদ পথে চলার পরামর্শ দেবে এবং দিশাহারাদের আলোর পথ দেখাবে।

নাজরানা চৌধুরী রুনা – স্বপ্নাদেরকে এই পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে আর ও বললেন – বর্তমান বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি ৪০ লাখ নাগরিক প্রবীণ যারা ৬০ বা তদূর্ধ্ব বছর বয়সী। ২০২৫ সাল নাগাদ প্রবীণের সংখ্যা হবে প্রায় দুই কোটি, ২০৫০ সালে প্রায় সাড়ে চার কোটি এবং ২০৬১ সালে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি!! বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সচেতনতা, চিকিৎসা প্রযুক্তি এবং যাতায়াত-যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল অনেক বেড়েছে এবং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রবীণদের এখনো সেবা-সম্মান করা হয়। কিন্তু তাদের প্রতি অবহেলা, অযত্ন, দুর্ব্যবহার আর নির্যাতনের ঘটনা এখানেও কম নয়। আশঙ্কার কথা হলো, প্রবীণদের প্রতি এহেন আচরণের বিষয়ে আমরা কেউই পর্যাপ্ত মাত্রায় অবহিত, সচেতন অথবা সতর্ক নই।

বর্তমানে বাংলাদেশিদের গড় আয়ু ৭০ বছর আর অবসরগ্রহণের বয়স ৫৯ বছর। সাধারণত প্রবীণদের অথর্ব বা মূল্যহীন বলে অবহেলা না করে দেশের বিরাট সংখ্যক জ্ঞানী, দক্ষ এবং অভিজ্ঞ প্রবীণদের জন্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন। বয়স্ক বলে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা না করে দেশের ছোট-বড় নানা ধরনের সেবাদান কাজে নিয়োজিত প্রবীণদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ জন্য কর্মক্ষম ও সচ্ছল থাকতে তাদের সহায়তা করা প্রয়োজন।

সামর্থ্যবান প্রবীণদের জন্য সার্বক্ষণিক চিকিৎসাসেবা, সাহচর্য, স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তাপূর্ণ বিভিন্ন ধরনের প্রবীণ নিবাস ও প্রবীণ সেবাকেন্দ্র গড়ে তুলতে পারলে বিরাট সংখ্যক প্রবীণের বাসস্থান চিন্তা দূর হবে। প্রবীণ নারী, অটিস্টিক, প্রতিবন্ধী, অসুস্থ, হতদরিদ্র, আদিবাসী এবং সমাজবিচ্ছিন্ন প্রবীণদের অবস্থা ও চাহিদা বিশেষভাবে বিবেচনায় এনে সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগে নিরাপদ আবাসন তৈরি এবং লাগসই সেবার ব্যবস্থা করা বর্তমানে জরুরি হয়ে পড়েছে। পীড়াদায়ক আচরণ করা থেকে বিরত রেখে প্রবীণদের পারিবারিক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংশ্লিষ্ট রাখা প্রয়োজন। বয়সের ভারে রোগে-শোকে আক্রান্ত প্রবীণকে কষ্টসাধ্য উপার্জন কাজে নিয়োজিত করা যেমন, সম্পদ ও বাড়িঘর পাহারা দেওয়া, বাজার করা, রান্না করা, শিশুদের দেখভাল ও স্কুলে আনা-নেওয়া করা ইত্যাদি সাংসারিক কাজে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্দয়ভাবে ব্যবহার করা কোনোক্রমেই সমীচীন নয়। প্রবীণদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া, প্রয়োজনীয় ওষুধপথ্য, খাদ্য, পোশাক ইত্যাদি সরবরাহ করা এবং কাঙ্ক্ষিত সঙ্গ দেওয়া জরুরি। গণসেবা প্রাপ্তিতে, নানা স্থানে চলাচলে, সড়ক পারাপারে, যানবাহনের আসন পেতে এবং বিপদাপন্ন প্রবীণের যে কোনো সহায়তায় বলিষ্ঠ ও ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রবীণদের প্রতি অন্যায় আচরণ সংঘটিত হতে দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রতিবাদ করতে হবে এবং প্রতিবিধানের জোরাল ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিশ্বজুড়ে প্রবীণদের সংখ্যা বিস্ময়করভাবে বাড়ছে। ১৯৯৫ সালের ৫৪ কোটি ২০ লাখ বিশ্ব প্রবীণ জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হয়ে ২০২৫ সালে গিয়ে দাঁড়াবে ১২০ কোটিতে! তাদের প্রায় ৪৬ শতাংশ নিজেদের বাড়িতেই নানা প্রকারের নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হয়ে মারাত্মক শারীরিক ও আবেগীয় সমস্যায় পতিত হচ্ছেন।

প্রবীণের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনের মাত্রাও বেড়ে চলেছে। পৃথিবীর লাখ লাখ প্রবীণ ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন। বিষয়টি আজ একটি বৈশ্বিক সামাজিক ইস্যুতে পর্যবসিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজন বিশ্ববাসীর সক্রিয় নজরদারি। জাতিসংঘের তথ্যমতে, বিশ্বব্যাপী প্রবীণরা দুর্ব্যবহার, অবহেলা, নির্যাতন এবং শোষণের সম্মুখীন হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি। বিশ্বের প্রায় সব প্রবীণই কোনো না কোনো ধরনের দুর্ব্যবহারের শিকার হন; তবে অধিকাংশের ঘটনাই থাকে অনুচ্চারিত। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতিবছর প্রায় ৫০ লাখ প্রবীণ এ ধরনের অবস্থায় পতিত হন। কিন্তু বাস্তবে ঘটে এর প্রায় ২৩ গুণ বেশি ঘটনা যা সবার অজানাই রয়ে যায়।

দয়া-দাক্ষিণ্য বা করুণার দৃষ্টিতে নয়, মানবাধিকারের ভিত্তিতে এবং প্রাপ্য মর্যাদার যুক্তিতে প্রবীণদের চাওয়া-পাওয়ার সমাধান করা প্রয়োজন। এ জন্য দরকার গণসচেতনতা। আর এ গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রবীণদের প্রতি অবহেলা, অযত্ন, দুর্ব্যবহার আর নির্যাতনের ঘটনা এবং সবার করণীয় বিষয়গুলো দেশের সব শিক্ষা পাঠ্যসূচিতে এবং গণমাধ্যম কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে প্রবীণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হবে। জরাবিজ্ঞানীরা বাংলাদেশের প্রবীণদের তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন– তরুণ-প্রবীণ (৬০-৭০ বছর বয়সী), মধ্যম-প্রবীণ (৭০-৮০ বছর বয়সী) এবং অতি-প্রবীণদের (৮০ বা তদূর্ধ্ব বছর বয়সী)। এদের অবস্থা, সমস্যা, চাহিদা ইত্যাদি আলাদা আলাদাভাবে বিবেচনা করে সে অনুযায়ী তাদের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

সরকার প্রবীণদের জন্য বয়স্কভাতা কর্মসূচি, জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা-২০১৩, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন-২০১৩, প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রবীণ এবং নবীন সব শ্রেণির নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব সরকারের নেওয়া প্রবীণ কল্যাণ কর্মসূচিতে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করা, বলিষ্ঠ করা এবং নিজেদের স্বার্থেই এগিয়ে নেওয়া। সফল বার্ধক্যের স্বার্থে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রিয় বাংলাদেশ হয়ে উঠবে সব বয়সীর বসবাসের জন্য সমান উপযোগী একটি সুন্দর রাষ্ট্র।

এর কিছুদিন পর নাজরানা চৌধুরী চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে তার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান "মাতৃছায়া" প্রতিষ্ঠা করার কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন। আনুমানিক এক বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো সমাপ্ত করে প্রতিষ্ঠানটিকে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করার মত অবস্থায় নিয়ে আসেন। অতঃপর, প্রাথমিক অবস্থায় ১৮ জন গ্রেজুয়েশন করা মহিলাদেরকে নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। সে অনুযায়ী পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর অনেক মহিলা নিজেদের থাকা – খাওয়ার খরচ নিজেরা বহন করে এই প্রতিষ্ঠানে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেন, যদিও বিজ্ঞাপনে নাজরানা চৌধুরী পরিষ্কারভাবে লিখে দিয়েছিলেন যে এই প্রতিষ্ঠানে যারা থাকবেন তাদের থাকা খাওয়ার খরচ প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

নাজরানা চৌধুরী এই শিক্ষিত মহিলাদেরকে এনে বেকার বসায় না রেখে, তাদেরকে জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত রাখার চিন্তা করলেন। তিনি পরিকল্পনা করলেন যে এই প্রতিষ্ঠানে তিন ধরণের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রথম কার্যক্রম হবে, বিনা মূল্যে গার্মেন্টস শিল্পের জন্য অপারেটর প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং ITC খাতের জন্য কম্পিউটার অপারেটর প্রশিক্ষণ দেওয়া। দ্বিতীয় কার্যক্রমটি হবে, তিন সদস্য বিশিষ্ট মোট চারটি টিম (১) কৃষি (২) শিল্প (৩) ITC (৪) শিক্ষা- এই ৪ টি বিষয়ের উপর নিয়মিত গবেষণা করবে এবং রিপোর্ট তৈরি করবে এবং আরেকটি টিম সেই রিপোর্টগুলো সংবাদ মাধ্যম সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন NGO দের কাছে প্রেরণ করবে। আর তৃতীয় কার্যক্রম হবে, অত্যন্ত গরিব দুঃখী প্রবীণ কিছু মহিলাদেরকে প্রতি মাসে সাধ্য অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য করা। আর গবেষণা ও তথ্য প্রদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য, নাজরানা চৌধুরী দশটি কম্পিউটার ক্রয় করার ব্যবস্থা করলেন।

অতঃপর, একটি ছুটির দিন শুক্রুবার নাজরানা চৌধুরী তার "মাতৃছায়া" প্রতিষ্ঠান উদ্বাধন করার কথা সবাইকে জানিয়ে দিলেন। যে সব মহিলারা ঐ প্রতিষ্ঠানে থাকবেন, তারা সবাই আসলেন। আর ওদিকে রুনা - স্বপ্না সহ অনেকে ফ্যাক্টরি থেকে এই উদ্বাধনী অনুষ্ঠানে আসল।

অনুষ্ঠানে নাজরানা চৌধুরী তার পরিকল্পনাগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। এগুলু শুনে সবাই খুশি। এর পর নাজরানা চৌধুরীর অনুমতি নিয়ে রুনা বলা শুরু করল – আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই "মাতৃছায়া" প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দেখে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে – উপশহরে এরকম শত শত প্রতিষ্ঠান অনেক মহিয়সী মহিলারা গড়ে তুলবেন।

অবশেষে রুনা বলল – আমরা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করি। একটু সুন্দরভাবে আমার মনের আবেগগুলো প্রকাশ করার মত ভাষা আমার জানা নেই। তবে নাজরানা ম্যাডামের কথা শুনে আজকে আমার যে গানটি গাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে তা হল –

এ সুখের নেই কোনো সীমানা

শিল্পী: সাবিনা ইয়াসমিন

অ্যালবাম: স্বামী স্ত্রী

এ সুখের নেই কোন সীমানা

বসন্তেরই আমন্ত্রনে জড়িয়ে গেলাম আলিঙ্গনে

সফল হলো বুঝি সাধনা।

খুশির চরণ ধ্বনি আমার প্রানে

কী আবেশ ছুয়ে যায় আমার গানে।

চিরচেনা এই যে ভুবন

শত রঙ্গে রঙ্গিন এখন
স্বর্গ হলো বুঝি রচনা।।
জীবনের যত ফুলে এখন হাসে
হৃদয়ের আঙ্গিনায় সুরভি আসে।
এ জনমেই যেন আবার
নতুন জনম হলো আমার
ফুরিয়েই গেল ভাবনা।।

=১০=

দেখতে দেখতে সাতটি বছর পর হয়ে গেল। সুলতানার মেয়ে রুমানা এখন ঢাকা মেডিকেলে ডাক্তারি পড়ছে এবং সাজেদার মেয়ে সাদিয়া ঢাকা বিশ্ববীদ্যালয়ে জার্নালিজমে মাস্টার্সে পরে। সাবিনার মেয়ে রুহানা এবার নবম শ্রেনিতে পড়ে।

পহেলা বৈশাখ সাবিনার মেয়ে রুহানার জন্ম দিন। সেদিন রাত্রে সাবিনা, রুনারা সবাই যখন খেতে বসেছে, তখন একথাটি – সেকথার মাঝখানে রুনা বলল, আগামী পহেলা বৈশাখ ফ্যাক্টরি তো বন্ধ থাকবে, ঐদিন কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায় কিংবা কি করা যায়, তা নিয়ে কথা বলতে লাগলো। হঠাৎ তার মনে পড়ল, পহেলা বৈশাখ রুহানার জন্ম দিন। সাথে সাথে রুনা আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলো, পহেলা বৈশাখে আমরা কোথাও যাব না। আমরা ঐ দিন রুহানার জন্ম দিন পালন করব।

রুহানা তার রুনা খালার কথাটা শুনার পর তার মনের অজান্তেই ভাতগুলো কচলাতে থাকল। কিছুক্ষণ পর তার দু চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে ভাতের পাতে পরে ভাতের সাথে মিশে যেতে থাকল। রুহানার মনে পড়ল , প্রতি বছর তার বাবা রুহানা ও ছোট ভাই খালেদের জন্ম দিন ধুমধাম করে পালন করে। আর সেই অনুষ্ঠান্গুলুতে রুনারা সহ সবাই আনন্দ করত। কিন্ত এবছর রুহানার বাবা তো তাদের থেকে অনেক দুরে। ওরা আজ জানেনা তাদের বাবা পৃথিবীতে আদৌ বেচে আছে কিনা, আর বেচে থাকলে ও কোথায় আছে, কিভাবে আছে, কিছুই জানেনা। রুহানা আর অশ্রু সংবরণ করতে না পেরে ভাতের প্লেটে আধা আধি ভাত খাও য়া অবস্থায় উঠে পাশের রুমে জানালায় ছুটে গিয়ে কাঁদতে লাগল। রুনা পরিস্থিতি বুযতে পেরে তাড়াতাড়ি রুহানার কাছে গিয়ে, রুহানার পাশে বসে তাকে সান্তনা দিতে লাগলো। রুনা বার বার রুহানাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো যে ওর বাবা ফিরে আসবে. ...অবশ্যই ফিরে আসবে। কিছুক্ষণ পর স্বপ্না রুনাদের বাসায় আসল। রুহানার অবস্থা দেখে তার ও মন খারাপ হয়ে গেল।

সেদিন রাত্রেই রুনা ও স্বপ্না সিদ্ধান্ত নিল, ওরা রুহানার জন্ম দিনে একটি অনুষ্টান করবে, মোটামোটি ধুমধাম করে ওর জন্মদিন পালন করবে। তাদের ফ্যাক্টরিতে কয়েক জন ভালো গায়ক আছে। এর পরদিন তাদেরকে পহেলা বৈশাখে রুহানার জন্মদিনে আমন্ত্রণ করল এবং সাথে সাথে তাদের ফ্যাক্টরির জিএম অপারেশন কে ও দাওয়াত করল।

পহেলা বৈশাখ রুহানার জন্মদিন। রুনার বাড়ির সামনে একটা ছোট স্টেজ তৈরী করে। সন্ধ্যা সাতটায় অনুষ্টান শুরু হল। রুহানার জন্মদিনের অনুষ্টানে ঢাকা থেকে রুমানা ও সাদিয়া এসেছে। তাদের হাত খরচের জন্য মায়েদের পাঠানো টাকা থেকে কিছু টাকা বাঁচায়ে রুহানা ও তার ছুতো ভাই খালেদের জন্য কিছু নতুন জামা কাপড় ও নিয়ে এসেছে।

অনুষ্টান পরিচালনার দায়িত্ব নিল রুমানা। রুমানা শুরুতেই সাদিয়াকে কিছু বলার জন্য অনুরুধ করল। সাদিয়া স্টেজে উঠেই বলা শুরু করল - সত্যের মৃত্যু নেই। সত্যের কল বাতাসে নড়ে। এটা বলেই সে ইংরেজি

সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি *Henry Wadsworth Longfellow* এর একটি কবিতার কিছু অংশ আবৃতি করা শুরু করল -

791. Evangeline: A Tale of Acadie

By Henry Wadsworth Longfellow (1807–1882)

Only parts of an epic poem:

'Must we in all things look for the how, and the why, and the where-fore?
Daily injustice is done, and might is the right of the strongest!'
But without heeding his warmth, continued the notary public,—
'Man is unjust, but God is just; and finally justice
Triumphs; and well I remember a story, that often consoled me,
When as a captive I lay in the old French fort at Port Royal.'
This was the old man's favorite tale, and he loved to repeat it
When his neighbors complained that any injustice was done them.
'Once in an ancient city, whose name I no longer remember,
Raised aloft on a column, a brazen statue of Justice
Stood in the public square, upholding the scales in its left hand,
And in its right a sword, as an emblem that justice presided
Over the laws of the land, and the hearts and homes of the people.
Even the birds had built their nests in the scales of the balance,
Having no fear of the sword that flashed in the sunshine above them.
But in the course of time the laws of the land were corrupted;
Might took the place of right, and the weak were oppressed, and the mighty
Ruled with an iron rod. Then it chanced in a nobleman's palace
That a necklace of pearls was lost, and erelong a suspicion
Fell on an orphan girl who lived as a maid in the household.
She, after form of trial condemned to die on the scaffold,
Patiently met her doom at the foot of the statue of Justice.
As to her Father in heaven her innocent spirit ascended,
Lo! o'er the city a tempest rose; and the bolts of the thunder
Smote the statue of bronze, and hurled in wrath from its left hand
Down on the pavement below the clattering scales of the balance,
And in the hollow thereof was found the nest of a magpie,
Into whose clay-built walls the necklace of pearls was inwoven.'
Silenced, but not convinced, when the story was ended, the blacksmith
Stood like a man who fain would speak, but findeth no language;
All his thoughts were congealed into lines on his face, as the vapors
Freeze in fantastic shapes on the window-panes in the winter.

কবিতাটির সারাংশ বলতে গিয়ে সাদিয়া সংক্ষেপে বলল – প্রাচীন এক শহরে একদিন একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে একটি স্বর্ণের হার হারিয়ে গেল। দোষ পড়ল নিষ্পাপ কাজের মেয়েটির উপর। স্বর্ণের হার চুরির দায়ে কাজের মেয়েটিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। নিরপরাধ মেয়েটির মৃত্যু দন্ড যেদিন কার্যকর করা হল, সেদিন ভোরে শহরের উপর দিয়ে প্রচন্ড ঘূর্ণি ঝড় বয়ে গেল। সেই শহরে ন্যায় বিচারের প্রতীক বিশাল এক দাঁড়িপাল্লার ভাস্কর্য

স্থাপিত ছিল। সকালে দেখা গেল ঘূর্ণি ঝরে দাঁড়িপাল্লা মাটিতে ভেঙে পড়েছে এবং পাল্লার একাংশে চড়ুইপাখির একটি বাসা ভেঙে পরে আছে এবং সেই বাসার খরকুঠুতে স্বর্ণের হারটি জড়িয়ে আছে।

এরপর সাদিয়া বলল - আজ আমি আপনাদেরকে আমার একটি সুখবর বলতে এসেছি। আজ থেকে প্রায় নয় বছর আগে আমার মাকে একটি বাড়িতে স্বর্ণের হার চুরি করার অপবাদ দিয়ে অনেক বড় রকমের নাজেহাল করা হয়েছিল। সেই হারটি আমার মা চুরি করেনি। সেই হারটি চুরি করেছিলেন ঐ বাড়িরই নেশাগ্রস্ত বড় ছেলে খাইরুল সাহেব। সেদিন আমার মা অসহায় ছিল বলে আমার মায়ের কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। ঐ নেশাগ্রস্ত খাইরুল সাহেব নেশার টাকা যোগাড় করার জন্য আর ও বিভিন্ন জায়গায় চুরি করেন এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে ধরা পরে অনেকবার জেলে যান। এবং সব শেষে একটি নেশা নিরাময় প্রতিষ্টানে দীর্ঘদিন চিকিৎসা নিয়ে তিনি এখন সুস্থ হয়েছেন। কিন্তু সুস্থ হলে ও তার বিশ্বাস হয়েছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মায়ের কাছে তিনি ক্ষমা পাবেনা না ততক্ষন পর্যন্ত জীবনে আর সুখের সন্ধান তিনি পাবেন না। কথাগুলু বলতে বলতেই খাইরুল সাদিয়ার মায়ের কাছে করজোড়ে মিনতি করে তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

অতঃপর রুমানার আমন্ত্রণে জিএম অপারেশন হাতে একটি খাম নিয়ে ষ্টেজে উঠে মাইকের সামনে দাড়ালেন। তিনি খামটি দেখিয়ে বললেন, আজ আমি এখানে এসেছি একটি আনন্দ সংবাদ নিয়ে। আজকের এই অনুষ্টান আমাদের ফ্যাক্টরির শ্রমিক সাবিনার মেয়ে রুহানার জন্মদিন। বিগত এক সপ্তাহ আগে, BGMEA– এর কাছ থেকে আমার কাছে একটি চিঠি এসেছে যা আমি সাবিনাকে ও বলিনি। চিঠিতে বলা হয়েছে, BGMEA সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সারা দেশে গার্মেন্টস শ্রমিক –কর্মচারীদের যে সব ছেলে – মেয়েরা বিভিন্ন পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করবে, তাদেরকে বৃত্তি প্রদান করবে এবং যারা অত্যন্ত ভাল ফলাফল করবে, BGMEA তাদের লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত, তাদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেবে। এরই ধারাবাহিকতায়, বিগত ৮ম শ্রেনির সমাপনি (J.S.C – Junior School Certificate) পরীক্ষায় সারাদেশে রুহানা যে অত্যন্ত ভাল ফলাফল করেছে, তা বিবেচনা করে BGMEA সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে রুহানার ইউনিভার্সিটি লেভেল পর্যন্ত লেখাপড়ার সমস্ত খরচ BGMEA বহন করবে। জিএম অপারেশন আরো বলেন, আজ আমি রুহানার জন্য আমার পক্ষ থেকে অন্য রকম একটি উপহার নিয়ে এসেছি। এই উপহারটি হচ্ছে একটি ছোট ভিডিও ক্লিপ। এই ভিডিও ক্লিপটি বাংলাদেশের অসংখ্য প্রতিভাবান ছেলে-মেয়েদের প্রতিচ্ছবি।এটা রুহানার বয়সী দু'দল শিক্ষার্থীর অত্যন্ত গুরুত্তপূর্ণ বিতর্ক প্রতিযোগিতার। আমি চাই, রুহানা ও এদের মত হবে এবং বিশ্বে বাংলাদেশের মুখ উজ্জল করবে। অতপর তিনি প্রজেক্টরের মাধ্যমে ভিডিও ক্লিপটি প্রদর্শন করেন।

সাবিনার মনে পরে, রুহানা ও খালেদের জন্মদিন্গুলুতে রুহানার বাবা সব সময় কিছু ফকিরকে বাড়িতে দাওয়াত করে খাওয়াত। সেদিন ও সাবিনা রুহানা ও খালেদ কে দিয়ে কিছু ফকিরকে ডেকে আনল। অনুষ্ঠানের শুরু থেকে জিএম অপারেশন যখন কথা বলছিলেন, তখন থেকে, একজন পাগল ধরনের ফকির চুপচাপ দুরে বসে জিএম অপারেশন-এর কথাগুলু খুব মনোযোগ সহকারে শুনছিল।

ভিডিও ক্লিপটি দেখানো শেষ হওয়ার পর, জিএম অপারেশন রুহানাকে কাছে ডেকে এনে তাকে নিয়ে ষ্টেজে উঠে রুহানার হাতে BGMEA – এর খামটি তুলে দিলেন। সাথে সাথে তিনি বললেন, আমি শুনেছি, রুহানা ভালো গান করে, আমি এখন রুহানাকে বলব আজকের এই অনুষ্ঠানে একটি গান পরিবেশন করার জন্য।

ষ্টেজের একটু দুরে দাঁড়ানো ছিল রুহানার ছোট ভাই খালেদ. রুহানা স্টেজ থেকে নেমে ছোট ভাই খালেদের হাতে ধরে ষ্টেজে উঠে আসল। মাইকের সামনে দাড়িয়ে অশ্রু ভরা চোখে ও কান্না ভরা কণ্ঠে শুরু করলঃ

আয় খুকু আয়
শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

কাটেনা সময় যখন আর কিছুতে
বন্ধুর টেলিফোনে মন বসে না
জানালার গ্রীলটাতে ঠেকাই মাথা
মনে হয় বাবর মত কেউ বলে না
আয় খুকু আয় খুকু আয়
আয়রে আমার সাথে গান গেয়ে যা
নতুন নতুন সুর নে শিখে নে
কিছুই যখন ভাল লাগবে না তোর
পিয়ানোয় বসে তুই বাজাবিরে
আয় খুকু আয় খুকু আয় ।

সিনেমা যখন চোখে জ্বালা ধরায়
গরম কফির মজা জুড়িয়ে যায়
কবিতার বইগুলো ছুঁড়ে ফেলি
মনে হয় বাব যদি বলতো আমায়
আয় খুকু আয় খুকু আয়
আয়রে আমার সাথে আয় এখনি
কোথাও ঘুরে আসি শহর ছেড়ে
ছেলেবেলার মত বায়না করে
কাছ থেকে নেনা তুই আমায় কেড়ে
আয় খুকু আয় খুকু আয় ।

দোকানে যখন আসি সাজবো বলে
খোঁপাটা বেঁধে নেই ঠাণ্ডা হাওয়ায়
আরশিতে যখনই চোখ পড়ে যায়
মনে হয় বাবা যেন বলছে আমায়
আয় খুকু আয় খুকু আয়
আয়রে আমার কাছে আয় মামনি
সবার আগে আমি দেখি তোকে
দেখি কেমন খোঁপা বেঁধেছিস তুই
কেমন কাজল দিলি কালো চোখে

আয় খুকু আয় খুকু আয়।

ছেলেবেলার দিন ফেলে এসে
সবাই আমার মত বড় হয়ে যায়
জানিনা কজনে আমার মতন
মিষ্টি সে পিছু ডাক শুনতে যে পায়
আয় খুকু আয় খুকু আয়
আয়রে আমার পাশে আয় মামনি
এ হাতটা ভাল করে ধর এখনি
হারানো সেদিনে চল চলে যাই
ছোট্টবেলা তোর ফিরিয়ে আনি
আয় খুকু আয় খুকু আয় ।

(সুরঃ ভি বালসারা, শিল্পীঃ হেমন্ত মুখার্জী ও শ্রাবন্তী মজুমদার)

জনম দুখী
গীতিকার: আহমেদুর রহমান

জনম দুখী, কপাল পোড়া আমার এই জীবন
দু:খে - দু:খে জীবন গেল, সুখের দেখা পেলাম না
জনম দুখী, কপাল পোড়া আমার এই জীবন।

ছায়া ছিল মায়ের আঁচল, আশ্রয় ছিল বাবার আদর
শৈশবে যা জুটল আমার, কৈশোরে তা জুটল না
জনম দুখী, কপাল পোড়া আমার এই জীবন।

তখন থেকে দুখ-সাগরে ভাসছি আমি কালান্তরে,
দু:খ ভরা জীবনে আর কুল -কিনারা পেলাম না
জনম দুখী, কপাল পোড়া আমার এই জীবন।

পথ হারা এক পথিক আমি, দিক-বিদিকে ঘুরি-ফিরি
এতটা পথ পারি দিলাম, পথের দিশা পেলাম না
জনম দুখী, কপাল পোড়া আমার এই জীবন।

কথায় বলে, পোড়া কপাল যেদিকে যায় সাগর শুকায়
দু:খ! আমার দুখ -সাগরের পানি তো আর কমল না
জনম দুখী, কপাল পোড়া আমার এই জীবন।

নীড়-হারা এক পাখি আমি, নীড়ের খোঁজে জগত ঘুরি
নীড়ের আশায় ঘুরতে ঘুরতে, স্বপ্ন -নীড় তো পেলাম না

জনম দুখী, কপাল পোড়া আমার এই জীবন।

খই খেলাম, লাড্ডু খেলাম, ভাতের স্বাদ তো পেলাম না
দেশ-দুনিয়া ঘুরে দেখলাম মায়ের সুখ তো পেলাম না
জনম দুখী, কপাল পোড়া আমার এই জীবন।

আশা ছিল, এ জীবনে, এক দিন আমি বড় হব
অসহায়ের পাশে দাঁড়াবো, সেটা তো আর পারলাম না
জনম দুখী, কপাল পোড়া আমার এই জীবন।

স্বপ্ন ছিল, এ জীবনে, মলিন মুখে হাঁসি ফোটাবো
অভাগা এই জীবন আমার, হাঁসির দেখা পেলাম না
জনম দুখী, কপাল পোড়া আমার এই জীবন।

জগত জুড়ে দু:খে যারা, জ্ঞানী, গুনি, মহানেরা
মুখে তাদের ফোটায় হাঁসি, আমি কিছুই পারলাম না
জনম দুখী, কপাল পোড়া আমার এই জীবন।

দু:খে আমার জীবন গড়া, কান্না ভরা জীবন আমার,
হাঁসি ভরা জীবন যে আর কোথাও খোঁজে পেলাম না
জনম দুখী, কপাল পোড়া আমার এই জীবন।

দুঃখ ! আমার এই জীবনে, হারিয়ে যাব লোকালয়ে
জীবন যুদ্ধের কথা আমার, কেউ কোনদিন জানবে না
জনম দুখী, কপাল পোড়া আমার এই জীবন।

অশ্রু সাগর পাড়ি দিয়ে, ব্যথা ভরা জীবন নিয়ে
হারিয়ে গিয়ে স্মৃতির কিছুই রেখে যেতে পারলাম না
জনম দুখী, কপাল পোড়া আমার এই জীবন।

গানের শেষে রুহানা বুঝতে পারল, তার বাবা চলে এসেছে। স্টেজে পাগল লকটিই তার বাবা। সে দৌড়ে গিয়ে বাবার বুকে ঝাপিয়ে পড়ল। ততক্ষণে উপস্থিত সাবিনা, খালেদ ও রুহানার পিছনে পিছনে গিয়ে রুহানার বাবাকে জড়িয়ে ধরল। আন্দামান দ্বীপের নির্জন জঙ্গলে মৃত্যু যন্ত্রণার অন্যরকম একটি জীবন অতিবাহিত করার পর আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সংগঠন (International Organization for Migration - IOM) এর সহযোগিতায় সে দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

এই হৃদয় বিদারক দৃশ্যের পর রুমানা ষ্টেজের দিকে এগিয়ে গিয়ে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গাইতে শুরু করল:

পোশাক শিল্পী

গীতিকার: আহমেদুর রহমান

শিল্পী আমি পোশাক শিল্পের, পোশাক শিল্পই আমার প্রাণ
লক্ষ প্রাণের মুখে মুখে পোশাক শিল্পের জয়গান।

এগিয়ে যাবো হাতে নিয়ে, পোশাক শিল্পের বিজয় নিশান
লক্ষ প্রাণের মুখের হাঁসি, রাখবো মোরা চির অম্লান।

ব্যথা ভরা জীবন ভুলে, দুঃখ - কষ্ট পিছনে ফেলে
গড়বো মোরা স্বপ্নের স্বদেশ, হাঁসবে মোদের সব সন্তান।

লেখাপড়া করবে ওরা, জ্ঞানী-গুণী হবে তারা
মানব সেবার সর্ব ক্ষেত্রে রাখবে তারা অবদান।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের শেষ দিগন্ত, তাদের হবে ঠিকানা
জগৎ জুড়ে শুনবে সবাই তাদের সকল আহবান।

বিশ্ববাসী বলবে সেদিন ওদের সন্তানরা মহান
দুঃখ-কষ্ট ভুলবো সেদিন, দেখবো মোদের কি সম্মান।

যারা ভাবে পোশাক শিল্পের ছেলে মেয়ে বেমানান
গর্ব নিয়ে বলবে একদিন এরা কত মূল্যবান।

চাঁদাবাজি যাদের নেশা, যারা সমাজের মাস্তান
মানুষ হওয়ার জন্য তাদের, এটি বড় কর্মস্থান।

শিক্ষা এবং প্রযুক্তিই আনতে পারে উন্নতি
শেখার জন্য পোশাক শিল্প অনেক বড় প্রতিষ্ঠান।

দিশাহারা মা বোনেরা, যাদের কোথাও নেই স্থান
তাদের পাশে পোশাক শিল্প, দাঁড়িয়ে আছে গার্ডিয়ান।

সোনালী শিল্প, পোশাক শিল্পে, সবাই রাখুক অবদান
সবাই মিলে পোশাক শিল্পের যাত্রা রাখুক আগুয়ান।

এগিয়ে চলো পোশাক শিল্পী, অর্থনীতির বীর সেনা
পাশে আছে বাবার মত লক্ষ লক্ষ মহৎ প্রাণ। #

সমাপ্ত।

Copyright: Ahmedur Rahman. www.expobd.net. rahmana6456@gmail.com , mamoni456ma@gmail.com .

LOVE THE PEOPLE!!! LOVE THE EARTH!!! MAKE IT A HEAVEN FOR ALL!!!

The Beauty of the Universal Diversity of the Human Society

Only 55 years back, in 1960, the total population of the world was 3 billion which today in 2016 is 7.5 billion. It took hundreds of thousands of years for the world population to grow to 3 billion in 1960 – then in just 55 years, 3.5 billion people added to the world population. The human population entered the 20th century with 1.6 billion people and left the century with 6.1 billion. According to the UN estimates, it will rise to 9 billion by 2050.

To authenticate the facts and figures arising out of this trend of the dramatic growth of the world population and the global warming, I am quoting here some excerpts:

The Independent –UK, 22 June 2015: " Society will collapse by 2040 due to catastrophic food shortages, says study…. based on plausible climate trends, and a total failure to change course, the global food supply system would face catastrophic losses, and an unprecedented epidemic of food riots..".

Aljazeera.com, 15 August 2015: "Climate change 'set to fuel global food crisis …. Global food shortages to become three times more likely due to climate change, according to report by US and UK experts. …. With the world's population set to rise to nine billion by 2050 from 7.3 billion today, food production will need to increase by more than 60 percent and climate-linked market disruptions could lead to civil unrest".

The UN –WFP reports: 1. Some 795 million people in the world do not have enough food to lead a healthy active life. That's about one in nine people on earth. 2. The vast majority of the world's hungry people live in developing countries, where 12.9 percent of the population is undernourished. 3. Asia is the continent with the most hungry people - two thirds of the total. The percentage in southern Asia has fallen in recent years but in western Asia it has increased slightly. 4. Sub-Saharan Africa is the region with the highest prevalence (percentage of population) of hunger. One person in four there is undernourished. 5. Poor nutrition causes nearly half (45%) of deaths in children under five - 3.1 million children each year. 6. One out of six children -- roughly 100 million -- in developing countries is underweight. 7. One in four of the world's children are stunted. In developing countries the proportion can rise to one in three. 8. If women farmers had the same access to resources as men, the number of hungry in the world could be reduced by up to 150 million. 9. 66 million primary school-age children attend classes hungry across the developing world, with 23 million in Africa alone. 10. WFP calculates that US$3.2 billion is needed per year to reach all 66 million hungry school-age children.

The World Bank: "The world needs to produce at least 50% more food to feed 9 billion people by 2050. But climate change could cut crop yields by more than 25%. The land, biodiversity, oceans, forests, and other forms of natural capital are being depleted at unprecedented rates. Unless we change how we grow our food and manage our natural capital, food security—especially for the world's poorest—will be at risk."

Through this book ***"Poshak Shilpi"***, I have tried to highlight that in this world of growing ***"distrust"***, the actual enemies of the human society is **"poverty"** and **"climate change & natural calamities"**, not the difference of caste, creed or color. In this context, I have tried to echo the same belief that **"mutual trust"**, **"tolerance"**, **"fellow-feeling"**, **"respect for human rights and dignity"** together with the plans, policies, strategies and efforts of the world bodies, governments, NGOs and the humanitarian people, can play a vital role in facing these challenges of the catastrophic consequences. This book is a part of my motto: **Let us find the Beauty and the happiness in the Universal Diversity of the Human Society. Let us make Peace Prevail in the Earth.** And with this motto and through this book, I would like to keep raising a flag with the words: **Love the People!!! Love the Earth!!!. Make it a Heaven for all!!!.**